অনুপস্থিত নাকি? (যখন বাস্তবিকই অনুপস্থিত জানতে পারলেন, তখন বললেন) আমি তাকে (অনুপস্থিতির কারণে) কঠোর শাস্তি দেব কিংবা তাকে হত্যা করব অথবা সে কোন পরিষ্কার প্রমাণ (এবং অনুপস্থিতির যুক্তিসঙ্গত অজুহাত) পেশ করবে (এরূপ করলে তাকে ছেড়ে দেব)। অল্পক্ষণ পরে হুদহুদ এসে গেল এবং সুলায়মান (আ)-কে বলল, আমি এমন বিষয় অবগত হয়ে এসেছি, যা আপনি অবগত নন। (সংক্ষেপে এর বর্ণনা এই যে,) আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে (রাজত্বের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের মধ্য থেকে) সবকিছু দেয়া হয়েছে। তার কাছে একটি বিরাট সিংহাসন আছে। (তাদের ধর্মীয় অবস্থা এই যে) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখেছি যে, তারা আল্লাহ্‌কে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদতকে) পরিত্যাগ করে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের (এই) কার্যাবলী সুশোভিত করে রেখেছে। অতএব (এই কুকর্মকে সুশোভিত করার কারণে) তাদেরকে (সত্য) পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। ফলে তারা (সত্য) পথে চলে না অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌কে সিজদা করে না, যিনি (এমন সামর্থ্যবান যে,) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন বস্তুসমূহ (যেগুলোর মধ্যে বৃষ্টি ও মৃত্তিকার উদ্ভিদও আছে) প্রকাশ করেন এবং (এমন জ্ঞানী যে) তোমরা (অর্থাৎ সব সৃষ্ট জীব) যা (অন্তরে) গোপন রাখ, এবং যা (মুখে) প্রকাশ কর, তা সবই তিনি জানেন। (তাই) আল্লাহ্-ই এমন যে, তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি মহা-আরশের অধিপতি। সুলায়মান [(আ) একথা শুনে] বললেন, আমি এখন দেখব তুমি কি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদী? (আচ্ছা) আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর (সেখান থেকে কিছুটা ব্যবধানে) সরে পড় এবং দেখ, তারা পরস্পরে কি সওয়াল-জওয়াব করে। (এরপর তুমি চলে এস। তারা যা করবে, তাতে তোমার সত্যমিথ্যা জানা যাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

تَفَقُّد—وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ এর শাব্দিক অর্থ কোন জনসমাবেশে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির খবর নেয়া। তাই এর অনুবাদে খোঁজ নেওয়া ও পর্যবেক্ষণ করা বলা হয়। হযরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা মানব, জিন, জন্তু ও পশুপক্ষীদের উপর রাজত্ব দান করেছিলেন। রাজ্য শাসনের নীতি অনুযায়ী সর্বস্তরের প্রজাদের দেখাশোনা করা ও খোঁজখবর নেয়া শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে বলা হয়েছে—وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ—অর্থাৎ সুলায়মান (আ) তাঁর পক্ষী প্রজাদেরকে পরিদর্শন করলেন এবং দেখলেন যে, তাদের মধ্যে কে উপস্থিত এবং কে অনুপস্থিত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-রও এই সুঅভ্যাস ছিল। তিনি সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতেন, তিনি অসুস্থ হলে দেখার জন্য তশরীফ নিয়ে যেতেন, সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং কেউ কোন কষ্টে থাকলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতেন।

শাসকের জন্য জনসাধারণের এবং পীর-মুর্শিদের জন্য শিষ্য ও মুরিদদের খোঁজ-খবর নেওয়া জরুরী ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ) সর্বস্তরের প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতেন। এমন কি, যে হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে অন্যান্য পাখীর তুলনায় কম, সেই হুদহুদও তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থাকে নি। বরং বিশেষভাবে হুদহুদ সম্পর্কে তাঁর প্রশ্ন করার এক কারণ এটাও হতে পারে যে, হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে কমসংখ্যক ও দুর্বল। তাই প্রজাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে তিনি অধিক যত্নবান হয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত উমর ফারূক (রা) তাঁর খিলাফতের আমলে পয়গম্বরগণের এই সুন্নতকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেন। রাতের অন্ধকারে তিনি মদীনার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে সবার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কাউকে কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত দেখলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। এ ধরনের অজস্র ঘটনা তাঁর জীবনীতে উল্লিখিত আছে। তিনি বলতেন, যদি ফোরাত নদীর কিনারায় কোন ব্যাঘ্র কোন ছাগলছানাকে গিলে ফেলে, তবে এর জন্যও উমরকে প্রশ্ন করা হবে।—(কুরতুবী)

এ হচ্ছে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালনের রীতিনীতি, যা পয়গম্বরগণ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) যা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং যার ফলে মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করত। তাঁদের পর পৃথিবী এমন সুবিচার, ইনসাফ ও সাধারণ বিশ্বের শান্তি, সুখ ও নিশ্চয়তার সে দৃশ্য আর দেখেনি।

مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ—সুলায়মান (আ) বললেন, আমার কি হল যে আমি হুদহুদকে সমাবেশে দেখতে পাচ্ছি না ?

আত্মসমালোচনা ঃ এখানে স্থান ছিল একথা বলার—"হুদহুদের কি হল যে, সে সমাবেশে উপস্থিত নেই?" বলার ভঙ্গি পরিবর্তন করার কারণ সম্ভবত এই যে, হুদহুদ ও অন্যান্য পক্ষীর অধীনস্থ হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। হুদহুদের অনুপস্থিতি দেখে শুরুতে হযরত সুলায়মান (আ)-এর মনে এই আশংকা দেখা দিল যে, সম্ভবত আমার কোন ত্রুটির কারণে এই অনুগ্রহ হ্রাস পেয়েছে এবং এক শ্রেণীর পাখী অর্থাৎ হুদহুদ গায়েব হয়ে গেছে। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে, এরূপ কেন হল? সূফী-বুযুর্গদেরও অভ্যাস তাই। তাঁরা যখন কোন নিয়ামত হ্রাস পেতে দেখেন অথবা কোন কষ্ট ও উদ্বেগে পতিত হন, তখন তা নিরসনের জন্য বৈষয়িক উপায়াদির দিকে মনোযোগ দানের পূর্বে আত্মসমালোচনা করেন যে, আমা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কি কোন ত্রুটি হল. যদ্দরুন এই নিয়ামত প্রত্যাহার করা হয়েছে? কুরতুবী ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে এ স্থলে বুযুর্গদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, اذا فقد وا اما لهم تفقد وا اعما لهم অর্থাৎ তাঁরা যখন উদ্দেশ্যে

সফল হন না, তখন নিজেদের কার্যাবলীর খবর নেন যে, তাঁদের দ্বারা কি ত্রুটি হয়ে গেছে।

এই প্রাথমিক আত্মসমালোচনা ও চিন্তাভাবনার পর সুলায়মান (আ) বললেন, أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ—এখানে أم শব্দটি بل এর সমার্থবোধক।--(কুরতুবী) অর্থাৎ হুদহুদকে দেখার ব্যাপারে আমার দৃষ্টি ভুল করেনি; বরং সে উপস্থিতই নয়।

পক্ষীকুলের মধ্যে হুদহুদকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, এতসব পক্ষীর মধ্যে শুধু হুদহুদকে খোঁজার কি কারণ ছিল? তিনি বললেন, সুলায়মান (আ) তখন এমন জায়গায় অবস্থানরত ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা হুদহুদ পক্ষীকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্তুসমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত ঝরনাসমূহকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আ) হুদহুদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, এই প্রান্তরে কতটুকু গভীরতায় পানি পাওয়া যাবে এবং কোথায় মাটি খনন করলে প্রচুর পানি পাওয়া যাবে। হুদহুদ জায়গা চিহ্নিত করে দিলে তিনি জিনদেরকে মাটি খনন করে পানি বের করার আদেশ দিতেন। তারা ক্ষিপ্রগতিতে খনন করে পানি বের করতে পারত। হুদহুদ তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস বলেন— قف ياوقاف كيف يرى الهدهد باطن الارض وهو لايرى الفخ حين يقع فيه জ্ঞানিগণ, এই সত্য জেনে নাও যে, হুদহুদ পাখী মাটির গভীরে অবস্থিত বস্তুকে দেখে, কিন্তু মাটির ওপর বিস্তৃত জাল তার নজরে পড়ে না যাতে সে আবদ্ধ হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কারও জন্য যে কষ্ট অথবা সুখ অবধারিত করে দিয়েছেন, তার বাস্তব রূপ লাভ করা অবশ্যম্ভাবী। কোন ব্যক্তি জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা অথবা গায়ের জোরে ও অর্থের জোরে তা থেকে বাঁচতে পারে না।

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ—প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনার পর এটা হচ্ছে শাসকসুলভ নীতির প্রকাশ যে, অনুপস্থিতকে শাস্তি দিতে হবে।

যে জন্তু কাজে অলসতা করে, তাকে সুষম শাস্তি দেওয়া জায়েয ঃ হযরত সুলায়মান (আ)-এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জন্তুদেরকে এরূপ শাস্তি দেওয়া হালাল করে দিয়েছিলেন; যেমন সাধারণ উম্মতের জন্য জন্তুদেরকে যবাই করে তাদের গোশ্‌ত, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া এখনও হালাল। এমনিভাবে পালিত জন্তু গাভী, বলদ, গাধা, ঘোড়া, উট ইত্যাদি কাজে অলসতা করলে প্রয়োজন মাফিক প্রহারের সুষম শাস্তি দেওয়া এখনও জায়েয। অন্যান্য জন্তুকে শাস্তি দেওয়া আমাদের শরীয়তে নিষিদ্ধ।—(কুরতুবী)

أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ——অর্থাৎ হুদহুদ যদি তার অনুপস্থিতির কোন উপযুক্ত অজুহাত পেশ করে, তবে সে এই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া বিচারকের কর্তব্য। উপযুক্ত ওযর পেশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।

أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ——অর্থাৎ হুদহুদ তার ওযর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলল, আমি যা অবগত, আপনি তা অবগত নন। অর্থাৎ আমি এমন এক সংবাদ এনেছি, যা আপনার জানা ছিল না।

পয়গম্বরগণ 'আলেমুল গায়ব' নন ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন, এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পয়গম্বরগণ আলেমুল গায়ব নন যে, সবকিছুই তাঁদের জানা থাকবে।

وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ——'সাবা' ইয়ামনের একটি প্রসিদ্ধ শহর, যার অপর নাম মাআরিবও। সাবা ও ইয়ামনের রাজধানী সানআর মধ্যে তিনদিনের দূরত্ব ছিল।

ছোট কি বড়কে বলতে পারে যে, আমার জ্ঞান আপনার চাইতে বেশি? ঃ হুদহুদের উপরোক্ত কথাবার্তা দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করেন যে, কোন শাগরিদ তার ওস্তাদকে এবং আলিম নয় এমন কোন ব্যক্তি আলিমকে বলতে পারে যে, এ বিষয়ের জ্ঞান আপনার চাইতে আমার বেশি——যদি বাস্তবিকই এ বিষয়ে তার জ্ঞান অন্যের চাইতে বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, পীর ও মুরুব্বিদের সামনে এ ধরনের কথাবার্তা শিষ্টাচার-বিরোধী। কাজেই বর্জনীয়। হুদহুদের উক্তিকে প্রমাণরূপে পেশ করা যায় না। কারণ, সে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং ওযরকে জোরদার করার জন্য এ কথা বলেছে। এহেন প্রয়োজনে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ধরনের কোন কথা বললে তাতে দোষ নেই।

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ——অর্থাৎ আমি এক নারীকে পেয়েছি সে সাবা সম্প্রদায়ের রাণী অর্থাৎ তাদের উপর রাজত্ব করে। সাবার এই সম্রাজ্ঞীর নাম ইতিহাসে বিলকীস বিনতে শারাহীল বলা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তার জননী জিন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তার নাম ছিল মালআমা বিনতে শীসান। ——(কুরতুবী) তার পিতামহ হুদাহুদ ছিল সমগ্র ইয়ামনের একচ্ছত্র সম্রাট। তার চল্লিশটি পুত্র-সন্তান ছিল। সবাই সম্রাট হয়েছিল। বিলকীসের পিতা শারাহীল জনৈকা জিন নারীকে বিবাহ করেছিল। তারই গর্ভে বিলকীসের জন্ম হয়। জিন

নারীকে বিবাহ করার বিভিন্ন কারণ বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, সে সাম্রাজ্য ও রাজত্বের অহংকারে অন্য লোকদেরকে বলত, তোমাদের কেউ কুলে-কৌলীন্যে আমার সমান নও। তাই আমি বিবাহই করব না। আমি অসম বিবাহ পছন্দ করি না। এর ফলশ্রুতিতে লোকেরা জনৈকা জিন নারীর সাথে তার বিবাহ ঘটিয়ে দেয়। ---(কুরতুবী) প্রকৃতপক্ষে মানুষই ছিল তার সমগোত্র। কিন্তু সে মানুষকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করে তার সমান স্বীকার করেনি। সম্ভবত এই অহংকারের ফলেই আল্লাহ্ তার বিবাহ এমন নারীর সাথে অবধারিত করে দেন, যে তার সমানও ছিল না এবং স্বজাতিও ছিল না।

জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কি?ঃ এ ব্যাপারে কেউ কেউ এ কারণে সন্দেহ করেছেন যে, তারা জিন জাতিকে মানুষের ন্যায় সন্তান উৎপাদনের যোগ্য মনে করেন না। ইবনে আরাবী তাঁর তফসীর গ্রন্থে বলেন, এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, সহীহ্ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, মানব জাতির অনুরূপ জিনদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন ও নারী-পুরুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে, জিন নারীকে বিবাহ করা মানুষের জন্য হালাল কি না? এতে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকেই জায়েয বলেছেন। কেউ কেউ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় ভিন্ন জাতি হওয়ার কারণে হারাম সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ "আকামুল মারজান ফী আহকা-মিল জান" কিতাবে উল্লিখিত আছে। তাতে মুসলমান পুরুষের সাথে মুসলমান জিন নারীর বিবাহের কয়েকটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সন্তানাদি জন্মগ্রহণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহকারী বিলকীসের পিতা মুসলমানই ছিল না, তাই এ বিষয় নিয়ে এখানে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। তার কর্ম দ্বারা এই বিবাহের বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ করা যায় না। শরীয়তে সন্তান পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। বিলকীসের পিতা মানব ছিল। তাই বিলকীস মানবনন্দিনীই সাব্যস্ত হবে। কাজেই কোন কোন রেওয়ায়েতে সুলায়মান (আ) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন বলে যে উল্লেখ আছে, তা দ্বারা জিন নারীকে বিবাহ করার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। কারণ, বিলকীস নিজে জিন ছিল না। সুলায়মান (আ)-এর বিবাহ সম্পর্কে আরও বর্ণনা পরে আসছে।

নারীর জন্য বাদশাহ্ হওয়া অথবা কোন সম্প্রদায়ের নেত্রী ও শাসক হওয়া জায়েয কি না?ঃ সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, পারস্যবাসীরা তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর তার কন্যাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ জানার পর মন্তব্য করেছিলেন, قوم ولوا امرهم امرأة لن يفلح অর্থাৎ যে জাতি তাদের শাসনক্ষমতা একজন নারীর হাতে সমর্পণ করেছে, তারা কখনও সাফল্য লাভ করতে পারবে না। এ কারণেই আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন নারীকে শাসনকর্তৃত্ব, খিলাফত অথবা রাজত্ব সমর্পণ করা যায় না; বরং নামাযের ইমামতির ন্যায় বৃহৎ ইমামতি অর্থাৎ শাসনকর্তৃত্বও একমাত্র পুরুষের জন্যই

উপযুক্ত। বিলকীসের সম্রাজ্ঞী হওয়া দ্বারা ইসলামী শরীয়তের কোন বিধান প্রমাণিত হতে পারে না, যে পর্যন্ত একথা প্রমাণিত না হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহের পর তাকে রাজসিংহাসনে বহাল রেখেছিলেন। একথা কোন সহীহ্ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ—অর্থাৎ কোন সম্রাট ও শাসনকর্তার জন্য যেসব সাজসরঞ্জাম দরকার, তা সবই বিদ্যমান ছিল। সেই যুগে যেসব বস্তু অনাবিষ্কৃত ছিল, সেগুলো না থাকা এর পরিপন্থী নয়।

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ—আরশের শাব্দিক অর্থ রাজসিংহাসন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, বিলকীসের সিংহাসন ৮০ হাত দীর্ঘ, ৪০ হাত প্রস্থ এবং ৩০ হাত উচ্চ ছিল এবং মোতি, ইয়াকূত ও মণিমানিক্য দ্বারা কারুকার্যখচিত ছিল। তার পায়া ছিল মোতি ও জওহরের এবং পর্দা ছিল রেশমের। একের পর এক সাতটি তালাবদ্ধ প্রাচীরের অভ্যন্তরে সিংহাসনটি সংরক্ষিত ছিল।

وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ— এতে জানা গেল যে, বিলকীসের সম্প্রদায় নক্ষত্রপূজারী ছিল। তারা সূর্যের ইবাদত করত। কেউ কেউ বলেন, অগ্নি-পূজারী ছিল।—(কুরতুবী)

أَلَّا يَسْجُدُوا—এর সম্পর্ক الشَّيْطَانُ زَيَّنَ لَهُمُ অথবা صَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ এর সাথে। অর্থাৎ আল্লাহ্কে সিজদা না করার কথা শয়তান তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল অথবা শয়তান তাদেরকে সত্য পথ থেকে এভাবে নিবৃত্ত করল যে, আল্লাহ্কে সিজদা করবে না।

লেখা এবং পত্রও সাধারণ কাজকারবারে শরীয়তসম্মত দলীল ঃ اذْهَب بِّكِتَابِي هَٰذَا—হযরত সুলায়মান (আ) সাবার সম্রাজ্ঞীর কাছে পত্র প্রেরণকে তার সাথে দলীল সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন। এতে বোঝা গেল যে, সাধারণ কাজ-কারবারে লেখা এবং পত্র ধর্তব্য প্রমাণ। যেক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্যপ্রমাণ জরুরী, ফিকাহবিদগণ সেই ক্ষেত্রে পত্রকে যথেষ্ট মনে করেন নি। কেননা পত্র, টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না। সাক্ষ্যদাতা আদালতের সামনে এসে বর্ণনা করবে. এর ওপরই সাক্ষ্য নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। এতে অনেক রহস্য নিহিত

আছে। এ কারণেই আজকালও পৃথিবীর কোন আদালতে পত্র ও টেলিফোনের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণকে যথেষ্ট মনে করা হয় না।

মুশরিকদের কাছে পত্র লিখে পাঠানো জায়েয ঃ হযরত সুলায়মান (আ)-এর পত্র দ্বারা দ্বিতীয় মাস'আলা এই প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম প্রচার ও দাওয়াতের জন্য মুশরিক ও কাফিরদের কাছে পত্র লেখা জায়েয। সহীহ্ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে কাফিরদের কাছে পত্র লেখা প্রমাণিত আছে।

কাফিরদের মজলিস হলেও সব মজলিসে মানবিক চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত ঃ فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ---হযরত সুলায়মান (আ) হুদহুদকে পত্রবাহকের দায়িত্ব দিয়ে মজলিসের এই শিষ্টাচারও শিক্ষা দিলেন যে, সম্রাজ্ঞীর হাতে পত্র অর্পণ করে মাথার ওপর সওয়ার হয়ে থাকবে না; বরং সেখান থেকে কিছুটা সরে যাবে। এটাই রাজকীয় মজলিসের নিয়ম। এতে জানা গেল যে, সামাজিক শিষ্টাচার ও মানবিক চরিত্র সবার সাথেই কাম্য।

قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّىْۤ اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ

وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِىْ فِىْۤ اَمْرِىْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى

تَشْهَدُوْنِ ﴿٣٢﴾ قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ

اِلَيْكِ فَانْظُرِىْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً

اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْۤا اَعِزَّةَ اَهْلِهَاۤ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَاِنِّىْ

مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ ۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَآءَ

سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ۫ فَمَاۤ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّاۤ اٰتٰىكُمْ ۚ

بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٦﴾ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ

لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَاۤ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

(২৯) বিলকীস বলল, 'হে পারিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেওয়া হয়েছে। (৩০) সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই ঃ অসীম দাতা, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু ; (৩১) আমার মুকাবিলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।' (৩২) বিলকীস বলল, 'হে পারিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।' (৩৩) তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অতএব আপনি ভেবে দেখুন আমাদেরকে কি আদেশ করবেন।' (৩৪) সে বলল, 'রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে। তারাও এরূপই করবে। (৩৫) আমি তাঁর কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি ; দেখি, প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব আনে।' (৩৬) অতপর যখন দূত সুলায়মানের কাছে আগমন করল, তখন সুলায়মান বললেন, তোমরা কি ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ্‌ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখী থাক। (৩৭) ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[সুলায়মান (আ) হুদহুদের সাথে এই কথাবার্তার পর একখানা পত্র লিখলেন, যার বিষয়বস্তু কোরআনেই উল্লিখিত আছে। পত্রটি তিনি হুদহুদের কাছে সমর্পণ করলেন। হুদহুদ পত্রটিকে চঞ্চুতে নিয়ে রওয়ানা হল এবং একাকিনী বিলকীসের কাছে অথবা মজলিসে অর্পণ করল।] বিলকীস (পত্র পাঠ করে পারিষদবর্গকে পরামর্শের জন্য ডাকল এবং) বলল, হে পারিষদবর্গ, আমার কাছে একটি পত্র (যার বিষয়বস্তু খুবই) সম্মানিত (এবং মহান) অর্পণ করা হয়েছে। (শাসকসুলভ বিষয়বস্তুর কারণে সম্মানিত বলা হয়েছে। পত্রটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অলংকারপূর্ণ ছিল।) এই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই, (প্রথমে) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, (এরপর বলা হয়েছে) তোমরা (অর্থাৎ বিলকীস এবং জনগণসহ পারিষদবর্গ) আমার মোকাবেলায় অহমিকা করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে চলে আস। [উদ্দেশ্য সবাইকে দাওয়াত প্রদান। তারা হয়তো সুলায়মান (আ)-এর অবস্থা পূর্বেই অবগত ছিল, যদিও সুলায়মান (আ) তাদের অবস্থা জানতেন না। প্রায়ই এমন হয় যে, বড়রা ছোটদেরকে চেনে না এবং ছোটরা বড়দেরকে চেনে। কিংবা পত্র আসার পর জেনে থাকবে। পত্রের বিষয়বস্তু অবগত করার পর] বিলকীস বলল, হে পারিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও (যে, সুলায়মানের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত)। আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে (কখনও) কোন কাজে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করি না। তারা বলল, আমরা (সর্বান্তকরণে উপস্থিত আছি। যদি যুদ্ধ করা উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তবে আমরা) বিরাট শক্তিধর এবং কঠোর যোদ্ধা। অতঃপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অতএব আপনিই ভেবে দেখুন, আমাদেরকে কি আদেশ করবেন। বিলকীস বলল, (আমার মতে যুদ্ধ করা উপযোগী নয়। কেননা সুলায়মান একজন বাদশাহ। আর) রাজা-বাদশাহগণ যখন কোন জনপদে (বিরোধী মনোভাব নিয়ে) প্রবেশ করেন, তখন বিপর্যস্ত করে দেন এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে (তাদের শক্তি খর্ব করার জন্য) অপদস্থ করেন। (তাদের সাথে যুদ্ধ করা হলে সম্ভবত তারা জয়লাভ করবে। তখন) তারাও এরূপই করবে। (অতএব অনর্থক পেরেশানী ভোগ করা উপযুক্ত নয়। কাজেই যুদ্ধ তো আপাতত মুলতবী থাকবে এবং সমীচীন এই যে,) আমি তাঁর কাছে কিছু উপঢৌকন (কোন ব্যক্তির হাতে) পাঠাচ্ছি, অতপর দেখব, প্রেরিত লোক (সেখান থেকে) কি জওয়াব নিয়ে আসে। (তখন যুদ্ধের বিষয়ে পুনরায় চিন্তা-ভাবনা করা হবে। সেমতে উপঢৌকন প্রস্তুত করা হলে দূত তা নিয়ে রওয়ানা হল)। যখন দূত সুলায়মান (আ)-এর কাছে পৌঁছল, (এবং উপঢৌকন পেশ করল) তখন সুলায়মান (আ) বললেন, তোমরা কি (অর্থাৎ বিলকীস ও পারিষদবর্গ) ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? (তাই উপঢৌকন এনেছ? মনে রেখ,) আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন, তা শতগুণে উত্তম, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। (কেননা, তোমাদের কাছে কেবল দুনিয়া আছে, আর আমার কাছে দীন ও দুনিয়া উভয়টিই আছে এবং দুনিয়া তোমাদের চাইতে অনেক অধিক আছে। কাজেই আমি এগুলোর প্রতি লোভ করি না।) তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্ল বোধ কর (সুতরাং এই উপঢৌকন আমি গ্রহণ করব না)। তোমরা (এগুলো নিয়ে) তাদের কাছে ফিরে যাও। (তারা এখনও ঈমান আনলে সবই ঠিক। নতুবা) আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি তাদেরকে সেখান থেকে অপদস্থ করে বের করে দেব এবং তারা (লাঞ্ছনা সহকারে চিরতরে) পদানত (ও প্রজা) হয়ে যাবে (এরূপ নয় যে, বের করার পর স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারবে। বরং চিরকাল লাঞ্ছনা তাদের কণ্ঠহার হয়ে যাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ — كريم এর শাব্দিক অর্থ সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে কোন পত্রকে তখনই সম্ভ্রান্ত বলা হয়, যখন তা মোহরাঙ্কিত হয়। এ কারণেই এই আয়াতে كِتَابٌ كَرِيمٌ এর তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্, যুহায়র প্রমুখ كتاب مختوم তথা 'মোহরাঙ্কিত

পত্র' দ্বারা করেছেন। এতে জানা গেল যে, হযরত সুলায়মান (আ) পত্রের উপর তাঁর মোহর অঙ্কিত করেছিলেন। আমাদের রসূল (সা) যখন অনারব বাদশাহ্দের অভ্যাস জানতে পারলেন যে, তারা মোহরবিহীন পত্র পাঠ করে না, তখন তিনিও বাদশাহ্দের পত্রের জন্য মোহর নির্মাণ করান এবং কায়সর ও কিসরার পত্রে মোহর অঙ্কিত করে দেন। এতে বোঝা গেল যে, পত্রের উপর মোহর অঙ্কিত করা প্রাপক ও স্বীয় পত্র উভয়ের প্রতি সম্মান করার নামান্তর। আজকাল ইনভেলাপে পত্র বন্ধ করে প্রেরণ করার প্রচলন হয়ে গেছে। এটাও মোহরের বিকল্প। প্রাপকের সম্মান উদ্দেশ্য হলে খোলা চিঠি প্রেরণ করার পরিবর্তে ইনভেলাপে পুরে প্রেরণ করা সুন্নতের নিকটবর্তী।

সুলায়মান (আ)-এর পত্র কোন্ ভাষায় ছিল ঃ হযরত সুলায়মান (আ) আরব ছিলেন না; কিন্তু আরবী ভাষা জানা ও বোঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যে ক্ষেত্রে তিনি বিহংগকুলের বুলি পর্যন্ত জানতেন, সে ক্ষেত্রে আরবী ভাষা তো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ছিল। এটা জানা মোটে অসম্ভব নয়। কাজেই এটা সম্ভবপর যে সুলায়মান (আ) আরবী ভাষায় পত্র লিখেছিলেন। কারণ, প্রাপক (বিলকীস) আরব বংশোদ্ভূত ছিল। সে পত্র পাঠ করেছিল এবং বুঝেছিল। এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, সুলায়মান (আ) তাঁর মাতৃভাষায় পত্র লিখেছিলেন এবং কিলকীস দো-ভাষীর মাধ্যমে পত্রের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল।----(রূহুল মা'আনী)

পত্র লেখার কতিপয় আদব إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ কোরআন পাক মানবজীবনের কোন দিক সম্পর্কেও দিকনির্দেশ না দিয়ে ছাড়েনি। চিঠিপত্র প্রেরণের মাধ্যমে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনাও মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বিষয়। এ স্থলে সাবার সম্রাজ্ঞী বিলকীসের নামে হযরত সুলায়মান (আ)-এর পত্র আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একজন পয়গম্বরের চিঠি। কোরআন পাক একে উত্তম আদর্শ হিসেবে উদ্ধৃত করেছে। তাই এই পত্রে পত্র লিখন সম্পর্কে যেসব দিক নির্দেশ পাওয়া যায়, সেগুলো মুসলমানদের জন্যও অনুসরণীয়।

প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে, এরপর প্রাপকের ঃ এই পত্রে সর্বপ্রথম দিক নির্দেশ এই যে, পত্রটি সুলায়মান (আ) নিজের নাম দ্বারা শুরু করেছেন। প্রাপকের নাম কিভাবে লিখেছেন, কোরআনের ভাষায় তার উল্লেখ নেই। কিন্তু এ থেকে এটুকু জানা গেল যে, সর্বপ্রথম প্রেরকের নাম লেখা পয়গম্বরগণের সুন্নত। এর উপকারিতা অনেক। উদাহরণত পত্র পাঠ করার পূর্বেই প্রাপক জানতে পারবে যে, সে কার পত্র পাঠ করছে, যাতে সে সেই পরিবেশে পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করে এবং চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাতে কার পত্র, কোথা থেকে আসল, প্রাপক কে---এরূপ খোঁজাখুঁজি করার কষ্ট ভোগ করতে না হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বর্ণিত ও প্রকাশিত সব পত্রেই তিনি এই পন্থাই অবলম্বন করেছেন। তিনি من محمد عبد الله ورسوله এ কথার মাধ্যমে পত্র শুরু করেছেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন কোন বড়জন ছোটকে পত্র লেখে, তার নাম অগ্রে থাকলে তা আপত্তির বিষয় নয়। কিন্তু ছোটজন যদি তার পিতা, উস্তাদ, পীর অথবা কোন মুরুব্বির কাছে পত্র লেখে, তখন নাম অগ্রে থাকা আদবের খেলাফ হবে না কি? তার এরূপ করা উচিত কি না? এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের কর্ম ধারা বিভিন্ন রূপ। অধিকাংশ সাহাবী সুন্নতের অনুসরণকে আদবের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নামে যে সব চিঠি লিখেছেন, সেগুলোতেও নিজেদের নাম অগ্রে রেখেছেন। রূহুল মা'আনীতে বাহ্‌রে মুহীতের বরাত দিয়ে হযরত আনাস (র)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে---

ما كان احد اعظم حرمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اصحابه اذا كتبوا اليه كتبا بدأوا بانفسهم قلت وكتاب علاء الحضرمي يشهد له على ما روى - -

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র চাইতে অধিক সম্মানযোগ্য কেউ ছিল না; কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম যখন তাঁর কাছেও পত্র লিখতেন, তখন নিজেদের নামই প্রথম লিপিবদ্ধ করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নামে আলামী হাযরামীর পত্র এই বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

তবে রূহুল মা'আনীতে উপরোক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, এই আলোচনা উত্তম অনুত্তম সম্পর্কে-বৈধতা সম্পর্কে নয়। যদি কেউ নিজের নাম শুরুতে না লিখে পত্রের শেষে লিখে দেয়, তবে তাও জায়েয। ফকীহ আবুল-লাইস 'বুস্তান' গ্রন্থে বলেন, যদি কেউ প্রাপকের নাম দ্বারা পত্র শুরু করে, তবে এর বৈধতা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। কেননা, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পন্থাও নির্দ্বিধায় প্রচলিত আছে।

পত্রের জওয়াব দেওয়া পয়গম্বরগণের সুন্নত ঃ তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, কারও পত্র হস্তগত হলে তার জওয়াব দেওয়া সমীচীন। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্র উপস্থিত ব্যক্তির সালামের স্থলাভিষিক্ত। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পত্রের জওয়াবকে সালামের জওয়াবের ন্যায় ওয়াজিব মনে করতেন।---(কুরতুবী)

চিঠিপত্রে বিস্‌মিল্লাহ্ লেখা ঃ হযরত সুলায়মান (আ)-এর উল্লিখিত পত্র এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লিখিত সব পত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, পত্রের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা পয়গম্বরগণের সুন্নত। এখন বিস্‌মিল্লাহ্ লেখক নিজের নামের পূর্বে লিখবে, না পরে, এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পত্রাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, বিস্‌মিল্লাহ্ সর্বাগ্রে এবং নিজের নাম এর পরে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরপর প্রাপকের নাম লিখবে। কোরআন পাকে হযরত সুলায়মান (আ)-এর নাম পূর্বে ও বিস্‌মিল্লাহ্ পরে লিখিত আছে। বাহ্যত এ থেকে বিস্‌মিল্লাহ্ পরে লেখারও বৈধতা জানা যায়। কিন্তু ইবনে আবী হাতেম ইয়াযীদ ইবনে রূমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সুলায়মান (আ) প্রকৃতপক্ষে তাঁর পত্র এভাবে লিখেছিলেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان بن داود الى بلقيس ابنة ذى شرح وقومها - ان لا تعلوا الخ

বিলকীস তার সম্প্রদায়কে পত্রের মর্ম শোনানোর সময় সুলায়মান (আ)-এর নাম আগে উল্লেখ করেছে। কোরআন পাকে বিলকীসের উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে। সুলায়মান (আ)-এর আসল পত্রে বিস্‌মিল্লাহ্ আগে ছিল, না পরে, কোরআনে ঐ সম্পর্কে বর্ণনা নেই। এটাও সম্ভবপর যে, সুলায়মান (আ)-এর নাম খামের উপরে লিখিত ছিল এবং ভিতরে বিস্‌মিল্লাহ্ দ্বারা শুরু করা হয়েছিল। পত্র শোনানোর সময় বিলকীস সুলায়মান (আ)-এর নাম অগ্রে উল্লেখ করেছে।

মাস'আলা ঃ প্রত্যেক পত্রের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ লেখাই পত্র-লিখনের আসল সুন্নত। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বর্ণনা ও ইঙ্গিত থেকে ফিকাহ্‌বিদগণ এই সামগ্রিক নীতি লিপিবদ্ধ করেছেন যে, যে স্থানে বিস্‌মিল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্ তা'আলার কোন নাম লিখিত কাগজকে বেয়াদবী থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা নেই, বরং পাঠান্তে মন্ত্রতত্র ফেলে রাখা হয়, সেখানকার পত্রে বিস্‌মিল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্ তা'আলার কোন নাম লেখা জায়েয নয়। লিখলে লেখক বেআদবীর গোনাহে শরীক হয়ে যাবে। আজকাল মানুষ একে অপরকে যে সব চিঠিপত্র লেখে, সেগুলোকে সাধারণত আবর্জনায় ও নর্দমায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাই সুন্নত আদায় করণার্থে মুখে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে নেওয়া এবং কাগজে লিপিবদ্ধ না করা সমীচীন।

কোরআনের আয়াত সম্বলিত লেখা কোন কাফির ও মুশরিকের হাতে দেওয়া জায়েয কি? উপরোক্ত পত্র হযরত সুলায়মান (আ) বিলকীসের কাছে তখন প্রেরণ করেন, যখন সে মুসলমান ছিল না। অথচ পত্রে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিত ছিল। এতে বোঝা গেল যে, এরূপ করা জায়েয। রসূলুল্লাহ্ (সা) যেসব অনারব বাদশাহ্‌র নামে চিঠিপত্র লিখেছেন, তারা মুশরিক ছিল। তাঁর পত্রে কোরআনের কোন কোন আয়াত লিখিত থাকত। এর কারণ এই যে, কোরআন পাক কোন কাফিরের হাতে দেওয়া জায়েয নয়; কিন্তু যে গ্রন্থ অথবা কাগজে অন্য বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে কোন আয়াত লিখিত হয়, সাধারণ পরিভাষায় তাকে কোরআন বলা হয় না। কাজেই এর বিধানও কোরআনের অনুরূপ হবে না। এরূপ গ্রন্থ কাফিরের হাতেও দেওয়া যায় এবং ওযূ ছাড়াও স্পর্শ করা যায়।—(আলমগিরী)

পত্র সংক্ষিপ্ত, ভাবপূর্ণ, অলংকারপূর্ণ এবং মর্মস্পর্শী হওয়া উচিত ঃ হযরত সুলায়মান (আ)-এর এই পত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে কয়েক লাইনের মধ্যে সব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে এবং অলংকারশাস্ত্রের সর্বোচ্চ মাপকাঠিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাফিরের মুকাবিলায় নিজের রাজকীয় শান-শওকতও প্রকাশ পেয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণত্ববোধক গুণাবলী ও ইসলামের প্রতি দাওয়াতও রয়েছে। সাথে সাথে অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার নিন্দাও ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রও কোরআনী অলৌকিকতার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। হযরত কাতাদাহ্ বলেন, পত্র

লিখনে সব পয়গম্বরের সুন্নতও এই যে, লেখা দীর্ঘ না হওয়া চাই এবং কোন প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু পরিত্যক্ত না হওয়া চাই।---(রূহুল মা'আনী)

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ করা সুন্নত। এতে অপরের অভিমত দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং অপরের মনোরঞ্জনও হয়ঃ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ۔ أَفْتُونِي শব্দটি فَتْوَى থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন বিশেষ প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া। এখানে পরামর্শ দেওয়া এবং নিজের মত প্রকাশ করা বোঝানো হয়েছে। সম্রাজ্ঞী বিলকীসের কাছে যখন সুলায়মান (আ)-এর পত্র পৌঁছল, তখন সে তার সভাসদদেরকে একত্রিত করে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ তলব করল যে, এ ব্যাপারে কি করা উচিত! সে তাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য এ কথাও বলল, আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। এর ফলেই সেনাধ্যক্ষগণ ও মন্ত্রীবর্গ এর জওয়াবে পূর্ণ তৎপরতা সহকারে আদেশ পালনের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করল। তারা বলল: نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ ---হযরত কাতাদাহ্ বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিলকীসের পরামর্শ-সভার সদস্য তিনশ' তের ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই দশ হাজার লোকের নেতা ও প্রতিনিধি ছিল।

এ থেকে জানা গেল যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি সুপ্রাচীন। ইসলাম পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে এবং রাষ্ট্রের কর্মচারীদেরকে পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে ওহী আগমন করত এবং তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ লাভ করতেন। এ কারণে কোন পরামর্শ গ্রহণের প্রযোজন প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছিল না; কিন্তু উম্মতের জন্য সুন্নত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তাঁকেও আদেশ করা হয়েছে, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ----অর্থাৎ আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করুন। এতে একদিকে যেমন সাহাবায়ে কিরামের সন্তুষ্টি বিধান করা হয়, অপরদিকে ভবিষ্যৎ রাজকর্মচারীদেরকে পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করার তাকীদও হয়ে যায়।

সুলায়মান (আ)-এর পত্রের জওয়াবে বিলকীসের প্রতিক্রিয়াঃ রাষ্ট্রের অমাত্যবর্গকে পরামর্শে শরীক করে তাদের সহযোগিতা অর্জন করার পর সম্রাজ্ঞী বিলকীস নিজেই একটি মত স্থির করল, যার সারমর্ম এই ছিলঃ হযরত সুলায়মানের পরীক্ষা নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, তিনি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র পয়গম্বর কি-না। তিনি আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, না তিনি একজন আধিপত্যবাদী

সম্রাট? এই পরীক্ষা দ্বারা বিলকীসের লক্ষ্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই তিনি পয়গম্বর হলে তাঁর আদেশ পালন করা হবে এবং বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের নেশায় আমাদেরকে দাসে পরিণত করতে চান, তবে তার মুকাবিলা কিভাবে করা হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা করা হবে। এই পরীক্ষার পদ্ধতি সে এইরূপ স্থির করল যে, সুলায়মান (আ)-এর কাছে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করা হবে। যদি তিনি উপঢৌকন পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে বোঝা যাবে যে, তিনি একজন সম্রাটই। পক্ষান্তরে তিনি পয়গম্বর হলে ইসলাম ও ঈমান ব্যতীত কোন কিছুতে সন্তুষ্ট হবেন না। এই বিষয়বস্তু, ইবনে জরীর একাধিক সনদে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইবনে জুরায়জ ও ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। এ কথাই এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ --অর্থাৎ আমি সুলায়মান ও তাঁর সভাসদদের কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। এরপর দেখব--- যেসব দূত উপঢৌকন নিয়ে যাবে, তারা ফিরে এসে কি পরিস্থিতি বর্ণনা করে।

সুলায়মান (আ)-এর দরবারে বিলকীসের দূতদের উপস্থিতি ঃ ঐতিহাসিক ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহে বিলকীসের দূত ও উপঢৌকনের বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। যে বিষয়টুকু সব রেওয়ায়েতেই পাওয়া যায়, তা এই যে, উপঢৌকনে কিছু স্বর্ণের ইট, কিছু মণিমানিক্য, একশ' ক্রীতদাস এবং একশ' বাঁদী ছিল। কিন্তু বাঁদী-দেরকে পুরুষের পোশাক এবং ক্রীতদাসদেরকে মেয়েলী পোশাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সাথে বিলকীসের একটি পত্রও ছিল, যাতে সুলায়মান (আ)-এর পরীক্ষার জন্য কিছু প্রশ্ন লিখিত ছিল। উপঢৌকন নির্বাচনেও তাঁর পরীক্ষা কাম্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা দূতদের পৌঁছার পূর্বেই উপঢৌকনসমূহের পূর্ণ বিবরণ বলে দিয়েছিলেন। সুলায়মান (আ) জিনদেরকে আদেশ করলেন, দরবার থেকে নয় ফরসখ অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সোনা-রূপার ইট দ্বারা বিছানা করে দাও। পথিমধ্যে দুই পার্শ্বে অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট জন্তুদেরকে দাঁড় করিয়ে দাও। তাদের প্রস্রাব পায়খানাও যেন সোনা-রূপার বিছানার ওপর হয়। এমনিভাবে তিনি নিজ দরবারকেও বিশেষ যত্ন সহকারে সুসজ্জিত করলেন। ডানে বামে চার হাজার করে স্বর্ণের চেয়ার স্থাপন করা হল। একদিকে পণ্ডিতদের জন্য এবং অপরদিকে মন্ত্রীবর্গ ও রাজকর্মচারীদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা হল। মণিমানিক্য দ্বারা সম্পূর্ণ হল সুশোভিত করা হল। বিলকীসের দূতরা যখন স্বর্ণের ইটের উপর জন্তুদেরকে দণ্ডায়মান দেখল, তখন তারা নিজেদের উপঢৌকনের কথা চিন্তা করে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তারা তাদের স্বর্ণের ইট সেখানেই ফেলে দিল। অতপর তারা যতই সামনে অগ্রসর হতে লাগল, দুই দিকে জীবজন্তু ও বিহংগ-কুলের কাতার দেখতে পেল। এরপর জিনদের কাতার দেখে তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু যখন তারা দরবারে হযরত সুলায়মান (আ)-এর সামনে হাযির হল, তখন তিনি হাসিমুখে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাদের আদর-আপ্যায়ন করলেন।

কিন্তু তাদের উপঢৌকন ফেরত দিলেন এবং বিলকীসের সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন।—(কুরতুবী—সংক্ষেপিত)

সুলায়মান (আ) বিলকীসের উপঢৌকন গ্রহণ করলেন না ঃ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَآ اٰتٰنِىَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ—অর্থাৎ যখন বিলকীসের দূত উপঢৌকন নিয়ে সুলায়মান (আ)-এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি দূতদেরকে বললেন, তোমরা কি অর্থ-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আমাকে আল্লাহ্ যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন, তা তোমাদের অর্থ-সম্পদের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাই আমি এই উপঢৌকন গ্রহণ করব না। এগুলো ফেরত নিয়ে যাও এবং তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে তোমরা সুখী থাক।

কোন কাফিরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয কি না? ঃ হযরত সুলায়মান (আ) সম্রাজ্ঞী বিলকীসের উপঢৌকন কবূল করেন নি। এ থেকে জানা যায় যে, কাফিরের উপঢৌকন কবূল করা জায়েয নয় অথবা ভাল নয়। মাস'আলা এই যে, কাফিরের উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে যদি নিজের কিংবা মুসলমানদের কোন স্বার্থ বিঘ্নিত হয় কিংবা তাদের পক্ষে মতামত দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে কাফিরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয নয়।—(রূহুল মা'আনী) হ্যাঁ, যদি উপঢৌকন গ্রহণ করলে কোন ধর্মীয় উপকার সাধিত হয়; যেমন এর মাধ্যমে কোন কাফির ব্যক্তির মুসলমানদের সাথে সৌহার্দ-পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে, ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার অতপর মুসলমান হওয়ার আশা থাকে কিংবা তার কোন অনিষ্ট এর মাধ্যমে দূর করা যায়, তবে কবূল করার অবকাশ আছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সুন্নত এ ব্যাপারে এই যে, তিনি কোন কোন কাফিরের উপঢৌকন কবূল করেছেন এবং কারও কারও প্রত্যাখ্যান করেছেন। বুখারীর টীকা 'উমদাতুল-কারী'তে এবং সিয়ারে কবীরের টীকায় হযরত কা'ব ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, বারার ভাই আমের ইবনে মালিক কাফির মুশরিক অবস্থায় কোন প্রয়োজনে মদীনায় আগমন করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে দুইটি অশ্ব এবং দুইটি বস্ত্রজোড়া উপঢৌকন হিসাবে পেশ করল। তিনি এ কথা বলে তার উপঢৌকন ফিরিয়ে দিলেন যে, আমি মুশরিকের উপঢৌকন গ্রহণ করি না। আয়ায ইবনে হেমার মাজাশেয়ী তাঁর খেদমতে একটি উপঢৌকন পেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মুসলমান? সে বলল, না। তিনি তার উপঢৌকন এ কথা বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মুশরিকদের দান গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে এরূপ রেওয়ায়েতও বিদ্যমান আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কোন মুশরিকের উপঢৌকন কবূল করেছেন। বর্ণিত আছে যে, আবূ সুফিয়ান মুশরিক অবস্থায়

তাঁকে একটি চামড়া উপহার দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং জনৈক খৃস্টান একটি অত্যুজ্জ্বল রেশমী বস্ত্র উপঢৌকন হিসাবে পেশ করলে তিনি তা কবুল করেন।

এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে শামসুল-আয়েম্মা বলেন, আমার মতে কারণ ছিল এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কারও কারও উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে তার ইসলাম গ্রহণের আশা করছিলেন। পক্ষান্তরে কারও কারও উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে তাঁর মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাই তার উপঢৌকন কবুল করেছেন। ---(উমদাতুল কারী)

বিলকীস উপঢৌকন প্রত্যাখান করাকে নবী হওয়ার আলামত সাব্যস্ত করেছিল। এটা এ কারণে নয় যে, নবীর জন্য মুশরিকের উপঢৌকন কবুল করা জায়েয নয়; বরং সে প্রকৃতপক্ষে ঘুষ হিসাবে উপঢৌকন প্রেরণ করেছিল, যাতে এর মাধ্যমে সে সুলায়মান (আ)-এর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে।

قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ
مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ
مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ
مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۭ فَلَمَّا رَاٰهُ
مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۡ لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ
اَكْفُرُ ۭ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ
كَرِيْمٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ
الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾

(৩৮) সুলায়মান বললেন, হে পারিষদবর্গ 'তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে?' (৩৯) জনৈক দৈত্য জিন বলল, 'আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং আমি এ কাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত। (৪০) কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত, কৃপাশীল। (৪১) সুলায়মান বললেন, বিলকীসের সামনে তার সিংহাসনের আকার আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে সঠিক বুঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিশা নেই?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মোট কথা, দূতরা তাদের উপঢৌকন নিয়ে ফিরে গেল এবং আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বিলকীসের কাছে বর্ণনা করল। অবস্থা শুনে বিলকীসের পূর্ণ বিশ্বাস হল যে, তিনি একজন জ্ঞানী-গুণী পয়গম্বর। সেমতে তাঁর দরবারে হাযির হওয়ার জন্য সে দেশ থেকে রওয়ানা হল।) সুলায়মান (আ) ওহীর মাধ্যমে কিংবা কোন পক্ষীর সাহায্যে তার রওয়ানা হওয়ার কথা জানতে পেরে) বললেন, হে পারিষদবর্গ, তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে তার (বিলকীসের) সিংহাসন আমাকে এনে দেবে? (আত্মসমর্পণের কথাটি বাস্তব ঘটনা প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে। কেননা তারা এই উদ্দেশ্যেই আগমন করছিল। সিংহাসন আনার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই ছিল যে, তারা তাঁর মু'জিযাও দেখে নিক। কেননা এত বিরাট সিংহাসন এত কঠোর পাহারার মধ্য থেকে নিশ্চুপে নিয়ে আসা মানবশক্তি বহির্ভূত ব্যাপার। এটা জিন অনুগত হওয়ার কারণে হয়ে থাকলে জিন অনুগত হওয়াও তো একটি মু'জিযাই। যদি উম্মতের কোন ওলীর কারামতের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তবে ওলীর কারামতও পয়গম্বরের একটি মু'জিযা। কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে হয়ে থাকলে সেটা যে মু'জিযা, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। মোটকথা, সর্বাবস্থায় এটা মু'জিযা ও নবুয়তের প্রমাণ। উদ্দেশ্য এই হবে যে, তারা অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর সাথে সাথে এই মু'জিযার গুণাবলীও দেখুক, যাতে ঈমান ও বিশ্বাস গাঢ় হয়।) জনৈক দৈত্য জিন (জওয়াবে) আরয করল, আপনি আপনার এজলাস থেকে ওঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং (যদিও তা খুব ভারী; কিন্তু) আমি এ কাজের (অর্থাৎ তা এনে দেওয়ার) শক্তি রাখি (এবং যদিও তা মূল্যবান ও মোতি দ্বারা সজ্জিত; কিন্তু আমি) বিশ্বস্ত (এতে কোনরূপ খিয়ানত করব না।) যার কাছে কিতাবের (অর্থাৎ তাওরাতের কিংবা কোন ঐশী গ্রন্থের, যাতে আল্লাহ্‌র নামের প্রভাবাদি ছিল) জ্ঞান ছিল [অধিক সঙ্গত এই যে, এখানে স্বয়ং সুলায়মান (আ)-কে বোঝানো হয়েছে।] সে (সেই জিনকে) বলল, (তোর শক্তি তো এতটুকুই) আমি চোখের পলক মারতে মারতে তা তোর সামনে এনে হাযির করতে পারি। (কেননা মু'জিযার শক্তি বলে জানব। যে মতে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন। এমনিতেই কিংবা কোন "ইসমে ইলাহী"র মাধ্যমে সিংহাসন তৎক্ষণাৎ সামনে বিদ্যমান হয়ে গেল)। সুলায়মান (আ) যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন (আনন্দিত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য) বললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ (যে, আমার হাতে এই মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে), যাতে আমাকে পরীক্ষা করেন যে,

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না (আল্লাহ্ না করুন) অকৃতজ্ঞ হই। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাতে (আল্লাহ্ তা'আলার কোন উপকার নেই) এবং (এমনিভাবে) যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (সে-ও নিজেরই ক্ষতি করে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন ক্ষতি নেই। কেননা) আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত, কৃপাশীল। (এরপর) সুলায়মান (আ) বিলকীসের বুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য) আদেশ দিলেন, তার জন্য (অর্থাৎ তার বুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য) তার সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও (এর উপায় অনেক হতে পারে। উদাহরণত মোতির জায়গা পরিবর্তন করে দাও কিংবা অন্য কোন ভাবে) দেখব, সে সঠিক বুঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের (এ ব্যাপারে) দিশা নেই। (প্রথমাবস্থায় জানা যাবে যে, সে বুদ্ধিমতী। ফলে সত্য কথা বুঝবে বলে অধিক আশা করা যায়। তার সত্য বুঝবার প্রভাব দূর পর্যন্ত পৌঁছবে। শেষোক্ত অবস্থায় তার কাছ থেকে সত্য বোঝার আশা কমই করা যায়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সুলায়মান (অ.)-এর দরবারে বিলকীসের উপস্থিতি ঃ কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে লেখেন, বিলকীসের দূতগণ নিজেরাও ভীত ও হতভম্ব হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। সুলায়মান (আ)-এর যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনিয়ে দিলে বিলকীস তার সম্প্রদায়কে বলল, পূর্বেও আমার এই ধারণাই ছিল যে, সুলায়মান দুনিয়ার সম্রাট-দের ন্যায় কোন সম্রাট নন; বরং তিনি আল্লাহ্র কাছ থেকে বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। আল্লাহ্র পয়গম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামা-ন্তর। এরূপ শক্তি আমাদের নেই। একথা বলে সে সুলায়মান (আ)-এর দরবারে হাযির হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিল। বার হাজার সেনাধ্যক্ষকে সাথে নিল, যাদের প্রত্যেকের অধীনে এক লক্ষ করে সৈন্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা এমন প্রতাপ দান করেছিলেন যে, তাঁর দরবারে কেউ প্রথমে কথা বলার সাহস করত না। একদিন তিনি দূরে ধূলিকণা উড়তে দেখে উপস্থিত সভাসদদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? তারা বলল, হে আল্লাহ্র নবী, সাম্রাজ্ঞী বিলকীস সদল-বলে আগমন করছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তখন সে সুলায়মান (আ)-এর দরবার থেকে এক ফরসখ অর্থাৎ প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল। তখন হযরত সুলায়মান (আ) তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

يَا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

সুলায়মান (আ) পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন যে, বিলকীস তাঁর দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করে আগমন করছে। এমতাবস্থায় তিনি ইচ্ছা করলেন যে, সে রাজকীয় শক্তি ও শান-শওকতের সাথে একটি পয়গম্বরসুলভ মু'জিযাও প্রত্যক্ষ করুক। এটা তার বিশ্বাস স্থাপনে অধিক সহায়ক হবে। সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা জিন

বশীভূত রাখার সাধারণ মু'জিযা দান করেছিলেন। সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলার ইঙ্গিত পেয়ে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, বিলকীসের এখানে পৌঁছার পূর্বেই তার সিংহাসন কোনরূপে এখানে পৌঁছা দরকার। তাই পারিষদবর্গকে (তাদের মধ্যে জিনও ছিল) সম্বোধন করে এই সিংহাসন নিয়ে আসার জন্য বলে দিলেন। বিলকীসের সমস্ত ধনসম্পদের মধ্য থেকে রাজকীয় সিংহাসনকে বেছে নেওয়াও সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, এটাই তার সর্বাধিক সংরক্ষিত বস্তু ছিল। সিংহাসনটি সাতটি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি সুরক্ষিত মহলে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। বিলকীসের আপন লোকেরাও সেখানে গমন করত না। দরজা ও তালা না ভেঙ্গে সেটা বেহাত হয়ে যাওয়া এবং এত দূরবর্তী স্থানে পৌঁছে যাওয়া আল্লাহ্ তা'আলার অগাধ শক্তিবলেই সম্ভবপর ছিল। এটা বিলকীসের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনের বিরাট উপায় হতে পারত। এর সাথে এ বিশ্বাসও অবশ্যম্ভাবী ছিল যে, সুলায়মান (আ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই কোন বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। ফলে তাঁর হাতে এমন অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশ লাভ করেছে।

قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ—مسلمين শব্দটি مسلم-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত, আত্মসমর্পণকারী। পরিভাষায় ঈমানদারকে মুসলিম বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী, অনুগত। কারণ, তখন সম্রাজ্ঞী বিলকীসের ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং সে হযরত সুলায়মান (আ)-এর কাছে উপস্থিত হওয়া এবং কিছু আলাপ-আলোচনা করার পর মুসলমান হয়েছিল। কোরআনের পরবর্তী আয়াতের ভাষা থেকে তাই বোঝা যায়।

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ—অর্থাৎ যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল। এই ব্যক্তি কে? এ সম্পর্কে এক সম্ভাবনা তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বয়ং সুলায়মান (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ্র কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। এমতাবস্থায় গোটা ব্যাপারটাই একটা মু'জিযা এবং বিলকীসকে পয়গম্বরসুলভ মু'জিযা দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই এ ব্যাপারে আপত্তির কোন কিছু নেই। কিন্তু কাতাদাহ্ প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে ইবনে জরীর বর্ণনা করেন এবং কুরতুবী একেই অধিকাংশের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন যে, এই ব্যক্তি সুলায়মান (আ)-এর একজন সহচর ছিল। ইবনে ইসহাক তাঁর নাম আসিফ ইবনে বারখিয়া বর্ণনা করেছেন। তিনি সুলায়মান (আ)-এর বন্ধু ছিলেন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে তাঁর খালাত ভাই ছিলেন। তিনি 'ইসমে আযম' জানতেন। ইসমে আযমের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা উচ্চারণ করে যে দোয়াই করা হয়, তা কবুল হয় এবং যাই চাওয়া হয়, তাই পাওয়া যায়। এ থেকে জরুরী নয় যে, সুলায়মান (আ) ইসমে আযম জানতেন না। কেননা এটা অবাস্তব নয় যে, সুলায়মান (আ) তাঁর এই

মহান কীর্তি তাঁর উম্মতের কোন ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত হওয়াকে অধিক উপযোগী মনে করেছেন। ফলে বিলকীসকে তা আরও বেশি প্রভাবিত করবে। তাই নিজে এই কাজ করার পরিবর্তে সহচরদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন أَيُّكُمْ يَأْتِينِي —(ফুসূসুল হিকাম) এমতাবস্থায় এই ঘটনা আসিফ ইবনে বারখিয়ার কারামত হবে।

মু'জিযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্যঃ প্রকৃত সত্য এই যে, মু'জিযার মধ্যে স্বভাবগত কারণাদির কোন দখল থাকে না; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার কাজ। কোরআন পাকে বলা হয়েছেঃ

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ —কারামতের অবস্থাও হুবহু তদ্রূপ। এতেও স্বভাবগত কারণাদির কোন দখল থাকে না; বরং সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে কোন কাজ হয়ে যায়। মু'জিযা ও কারামত—এ উভয়টিও মু'জিযা ও কারামত প্রকাশ ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যদি কোন অলৌকিক কাজ ওহীর অধিকারী পয়গম্বরের হাতে প্রকাশ পায়, তবে তাকে মু'জিযা বলা হয়। পক্ষান্তরে এরূপ কাজই নবী ব্যতীত অন্য কারও হাতে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলা হয়। আলোচ্য ঘটনায় যদি এই রেওয়ায়েত সহীহ্ হয় যে, বিলকীসের সিংহাসন আনার কাজটি সুলায়মান (আ)-এর সহচর আসিফ ইবনে বারখিয়ার হাতে সম্পন্ন হয়েছে, তবে একে কারামত বলা হবে। প্রত্যেক ওলীর গুণাবলী তাঁর পয়গম্বরের গুণাবলীর প্রতিবিম্ব এবং তাঁর কাছ থেকেই অর্জিত হয়ে থাকে। তাই উম্মতের ওলীদের হাতে যে সব কারামত প্রকাশ পায়, সেগুলো পয়গম্বরের মু'জিযারূপে গণ্য হয়ে থাকে।

বিলকীসের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা কারামত, না তাসাররুফ?ঃ শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী একে আসিফ ইবনে বারখিয়ার তাসাররুফ সাব্যস্ত করেছেন। পরিভাষায় তাসাররুফের অর্থ কল্পনা ও দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করে বিস্ময়কর কাজ প্রকাশ করা। এইজন্য নবী, ওলী এমনকি, মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। এটা মেসমেরিজমের অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া। সূফী বুযুর্গগণ মুরীদদের সংশোধনের নিমিত্ত মাঝে মাঝে এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগান। ইবনে আরাবী বলেন, পয়গম্বরগণ তাসাররুফের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। তাই হযরত সুলায়মান (আ) এ কাজে আসিফ ইবনে বারখিয়াকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কোরআন পাক এই তাসাররুফকে عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ (কিতাবের জ্ঞান)-এর ফলশ্রুতি বলেছে। এতে এই অর্থই অগ্রগণ্য হয় যে, এটা কোন দোয়া অথবা ইসমে আযমের ফল ছিল, যার তাসাররুফের সাথে কোন সম্পর্ক নেই; বরং এটা কারামতেরই সমঅর্থবোধক।

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ—আমি এই সিংহাসন চোখের পলক মারার আগেই এনে দেব—আসিফের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, কাজটি তাঁর নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা হয়েছে। এটা তাসাররুফের আলামত। কেননা কারামাত ওলীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এই সন্দেহের জওয়াব এই যে, সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে আমি এ কাজ এত দ্রুত করে দেব।

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

(৪২) অতপর যখন বিলকীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, মনে হয় এটা সেটাই। আমরা পূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহও হয়ে গেছি। (৪৩) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যার ইবাদত করত, সে-ই তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিল। নিশ্চয় সে কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৪৪) তাকে বলা হল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল সে ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। সুলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলকীস বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[সুলায়মান (আ) সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে রেখেছিলেন] অতঃপর যখন বিলকীস এসে গেল, তখন তাকে (সিংহাসন দেখিয়ে) বলা হল, [সুলায়মান (আ) নিজে বলেছেন কিংবা অন্য কাউকে দিয়ে বলিয়েছেন,] তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে

বলল, হ্যাঁ এরূপই তো। (বিলকীসকে এরূপ প্রশ্ন করার কারণ এই যে, আসলের দিক দিয়ে তো এটা সেই সিংহাসনই ছিল, কিন্তু আকৃতি বদলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই এরূপ বলা হয়নি যে, এটা কি তোমার সিংহাসন? বরং বলা হয়েছে, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? বিলকীস সিংহাসনটি চিনে ফেলে এবং আকার বদলিয়ে দেওয়ার বিষয়ও অবগত হয়ে যায়। তাই জওয়াবও জিজ্ঞাসার অনুরূপ দিয়েছে। সে এ কথাই বলল,) আমরা এ ঘটনার পূর্বেই (আপনার নবুয়তের বিষয়) অবগত হয়েছি এবং আমরা (তখন থেকেই মনেপ্রাণে) আজ্ঞাবহ হয়ে গেছি, যখন দূতের মুখে আপনার গুণাবলী জ্ঞাত হয়েছিলাম। সুতরাং এই মু'জিযার মোটেই প্রয়োজন ছিল না। যেহেতু মু'জিযার পূর্বেই বিশ্বাস স্থাপন করা চূড়ান্ত বুদ্ধির পরিচায়ক, তাই আল্লাহ্ তা'আলা তার বুদ্ধিমত্তা ফুটিয়ে তুলেছেন যে, সে বাস্তবিকই বুদ্ধিমতী নারী ছিল। তবে কিছুকাল সে বিশ্বাস স্থাপন করেনি; এর কারণ এই যে,) আল্লাহ্র পরিবর্তে যার পূজা সে করত, সেই তাকে (ঈমান থেকে) নিবৃত্ত করেছিল। (পূজার এই অভ্যাসের কারণ এই যে,) সে কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। [সুতরাং সবাইকে যা করতে দেখেছে, সে তাই করেছে। জাতীয় অভ্যাস অনেক সময় মানুষের চিন্তা-ভাবনার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বুদ্ধিমতী হওয়ার কারণে সতর্ক করা মাত্রই সে বুঝে ফেলেছে। এরপর সুলায়মান (আ) ইচ্ছা করলেন যে, মু'জিযা ও নবুয়তের শান দেখানোর সাথে সাথে তাকে সাম্রাজ্যের বাহ্যিক শান-শওকতও দেখানো দরকার, যাতে সে নিজেকে পার্থিব দিক দিয়েও মহান মনে না করে। তাই তিনি একটি স্ফটিকের প্রাসাদ নির্মাণ করালেন এবং তার বারান্দায় চৌবাচ্চা তৈরি করালেন। তাতে পানি ও মাছ দিয়ে ভর্তি করে স্ফটিক দ্বারা আবৃত করে দিলেন। স্ফটিক এত স্বচ্ছ ছিল যে, বাহ্যত দৃষ্টিগোচর হত না। চৌবাচ্চাটি এমন স্থানে নির্মিত ছিল যে, প্রাসাদে যেতে হলে একে অতিক্রম করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এসব বন্দোবস্তের পর) বিলকীসকে বলা হল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর (সম্ভবত এই প্রাসাদই অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বিলকীস চলল। পথিমধ্যে চৌবাচ্চা পড়ল।) যখন সে তার বারান্দা দেখল, তখন সে তাকে পানি-ভর্তি (জলাশয়) মনে করল এবং (এর ভেতরে যাওয়ার জন্য কাপড় টেনে ওপরে তুলল এবং) সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। (তখন) সুলায়মান (আ) বললেন, এ তো (বারান্দাসহ সম্পূর্ণটুকু) স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। চৌবাচ্চাটিও স্ফটিক দ্বারা আবৃত। কাজেই কাপড়ের আঁচল টেনে ওপরে তোলার প্রয়োজন নেই।) বিলকীস [জেনে গেল যে, এখানে পার্থিব কারিগরির অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহও এমন রয়েছে, যা সে আজ পর্যন্ত স্বচক্ষে দেখেনি। ফলে, তার মনে সবদিক দিয়েই সুলায়মান (আ)-এর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা লাভ করল। সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে] বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি (এ পর্যন্ত) নিজের প্রতি জুলুম করেছিলাম (যে, শিরকে লিপ্ত ছিলাম)। আমি (এখন) সুলায়মান (আ)-এর সাথে (অর্থাৎ তাঁর অনুসৃত পথে) বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সুলায়মান (আ)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি?ঃ এতটুকু বর্ণনা করেই উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিলকীসের কাহিনী সমাপ্ত করা হয়েছে যে, সুলায়মান (আ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে ইসলামে দীক্ষিতা হয়ে গেল। এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কোরআন পাক নিশ্চুপ। এ কারণেই জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উয়ায়নাকে জিজ্ঞাসা করল, সুলায়মান (আ)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? তিনি বললেন, তার ব্যাপার أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ কোরআন এ পর্যন্ত তার অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা পরিত্যাগ করে দিয়েছে। অতএব আমাদের এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইবনে আসাকির হযরত ইকরামা থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর হযরত সুলায়মান (আ)-এর সাথে বিলকীস পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং তাকে তার রাজত্ব বহাল রেখে ইয়ামনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিমাসে হযরত সুলায়মান (আ) সেখানে গমন করতেন এবং তিনদিন অবস্থান করতেন। হযরত সুলায়মান (আ) বিলকীসের জন্য ইয়ামনে তিনটি নজিরবিহীন ও অনুপম প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ
بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾
قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ۚ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ
أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ
فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ
أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا
لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۖ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

(৪৫) আমি সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহকে এই মর্মে প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। অতঃপর তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হল। (৪৬) সালেহ্ বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কল্যাণের পূর্বে দ্রুত অকল্যাণ কামনা করছ কেন? তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না কেন? সম্ভবত তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে।' (৪৭) তারা বলল, 'তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে আমরা অকল্যাণের প্রতীক মনে করি।' সালেহ্ বললেন, 'তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহ্‌র কাছে; বরং তোমরা এমন সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। (৪৮) আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশময় অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং সংশোধন করত না। (৪৯) তারা বলল, 'তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্‌র নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবারবর্গকে হত্যা করব। অতপর তার দাবীদারকে বলে দেব যে, তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। আমরা নিশ্চয়ই সত্যবাদী। (৫০) তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক চক্রান্ত করেছিলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারে নি। (৫১) অতএব দেখ তাদের চক্রান্তের পরিণাম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছি। (৫২) এই তো তাদের বাড়ীঘর—তাদের অবিশ্বাসের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে। (৫৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং পরহেযগার ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের (জ্ঞাতি) ভাই সালেহকে (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছি এই মমে যে, তোমরা (শিরক ত্যাগ করে) আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। (এমতাবস্থায় তাদের সবারই ঈমান আনা উচিত ছিল; কিন্তু এ প্রত্যাশার বিপরীতে) অতঃপর দেখতে দেখতে তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্ক করতে লাগল। [অর্থাৎ একদল ঈমান আনল এবং একদল ঈমান আনল না। তাদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা ও আলোচনা হয়, তার কিয়দংশ সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে— قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ এবং কিয়দংশ এই সূরারই পরবর্তী আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ ।

—তারা যখন কুফর ত্যাগ করতে সম্মত হল না, তখন সালেহ্ (আ) পয়গম্বরগণের রীতি অনুযায়ী তাদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করলেন; যেমন সূরা আ'রাফে আছে

فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ——তখন তারা বলল, সেই আযাব কোথায় আছে নিয়ে আস ; যেমন সূরা আ'রাফে আছে—قَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ——এর পরিপ্রেক্ষিতে] সালেহ্ (আ) বললেন, ভাই সকল, তোমরা সৎকর্ম (অর্থাৎ তওবা ও ঈমান)-এর পূর্বে দ্রুত আযাব কামনা করছ কেন ? (অর্থাৎ আযাবের কথা শুনে ঈমান আনা উচিত ছিল ; কিন্তু তোমরা ঈমান আনার পরিবর্তে উল্টা আযাবই কামনা করে চলেছ। এটা খুবই ধৃষ্টতার কাজ। দ্রুত আযাব চাওয়ার পরিবর্তে) তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে (কুফর থেকে) ক্ষমা প্রার্থনা কর না কেন ? যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয় (অর্থাৎ আযাব থেকে নিরাপদ থাক)। তারা বলল, আমরা তো তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে অশুভ লক্ষণ মনে করি। (কারণ, যখন থেকে তোমরা এই ধর্ম বের করেছ এবং তোমাদের এই দল সৃষ্টি হয়েছে, সেদিন থেকেই জাতি বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং অনৈক্যের ক্ষতিকারিতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এসব অনিষ্টের কারণ তোমরা)। সালেহ্ (আ) জওয়াবে বললেন, তোমাদের এই অমঙ্গল (অর্থাৎ অমঙ্গলের কারণ) আল্লাহ্‌র গোচরীভূত আছে (অর্থাৎ তোমাদের কুফরী কাজকর্ম আল্লাহ জানেন। এসব কাজকর্মের ফলেই অনিষ্ট দেখা দিয়েছে। বলা বাহুল্য, সেই অনৈক্যই নিন্দনীয়, যা সত্যের বিরোধিতা থেকে উদ্ভূত হয়। সুতরাং ঈমানদারগণ এ জন্য অভিযুক্ত হতে পারে না, বরং কাফিররা দোষী হবে। কোন কোন তফসীরে আছে যে, তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল। তোমাদের কুফরের অনিষ্ট এখানেই শেষ হয়ে যায়নি,) বরং তোমরা এমন সম্প্রদায়, যারা (এই কুফরের কারণে) আযাবে পতিত হয়ে গিয়েছ। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কাফির তো অনেকই ছিল ; কিন্তু দলপতি সেই শহরে (অর্থাৎ হিজরে) ছিল নয় ব্যক্তি, যারা দেশময় (অর্থাৎ জনপদের বাইরে পর্যন্তও) অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং (সামান্যও) সংশোধন করত না। (অর্থাৎ কোন কোন দুষ্কৃতিকারী তো এমন যে, কিছু দুষ্কৃতিও করে এবং কিছু সংশোধনও করে ; কিন্তু তারা বিশেষ দুষ্কৃতিকারীই ছিল। তারা একবার এই অনর্থ করল যে) তারা (একে অপরকে) বলল, তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্‌র নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রাত্রিকালে সালেহ্ (আ) ও তাঁর সংশ্লিষ্টবর্গের (অর্থাৎ মু'মিনগণের) ওপর হানা দেব। অতঃপর (তদন্ত হলে) তার দাবীদারকে বলব যে, তার সংশ্লিষ্টদের (এবং স্বয়ং তার) হত্যাকাণ্ডে আমরা উপস্থিতও ছিলাম না। (হত্যা করা দূরের কথা। এবং তাকীদের জন্য আরও বলে দেব) আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী। (চাক্ষুষ সাক্ষ্যদাতা তো কেউ থাকবে না। ফলে বিষয়টি চাপা পড়ে যাবে।) তারা এক গোপন চক্রান্ত করেছিল (যে, রাত্রিবেলায় এ কাজের জন্য রওয়ানা হবে) এবং আমিও এক গোপন ব্যবস্থা করেছিলাম ; কিন্তু তারা টের পায়নি। (তা এই যে, পাহাড়ের ওপর থেকে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড তাদের ওপর

গড়িয়ে পড়ল এবং তারা সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হল।—দুররে মনসুর) অতএব দেখুন তাদের চক্রান্তের পরিণাম। আমি তাদেরকে (উল্লিখিত উপায়ে) এবং তাদের (অবশিষ্ট) সম্প্রদায়কে (আসমানী আযাব দ্বারা) নাস্তানাবুদ করে দিয়েছি। (অন্য আয়াতে এ ঘটনা বর্ণিত আছে فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ থেকে فَعَقَرُوا النَّاقَةَ পর্যন্ত।) এই তো তাদের বাড়ীঘর—জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে, তাদের কুফরের কারণে (মক্কাবাসীরা শামের সফরে সেগুলো দেখতে পায়)। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন আছে। আমি ঈমানদার ও পরহিযগারদেরকে (পরিকল্পিত হত্যা থেকে এবং আল্লাহ্‌র আযাব থেকে) রক্ষা করেছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

رَهْطٌ—تِسْعَةُ رَهْطٍ শব্দের অর্থ দল। এখানে নয় ব্যক্তির মধ্য থেকে প্রত্যেককেই رَهْطٌ বলার কারণ সম্ভবত এই যে, তারা তাদের অর্থসম্পদ, জাঁকজমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে গণ্য হত এবং প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন দল ছিল। কাজেই এই নয় ব্যক্তিকে নয় দল বলা হয়েছে। তারা ছিল হিজর জনপদের প্রধান। হিজর শামদেশের একটি স্থানের নাম।

لَنُبَيِّتَنَّهُ وَاَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ

উদ্দেশ্য এই যে, আমরা সবাই মিলে রাতের অন্ধকারে তার ওপর ও তার জাতিগোষ্ঠির ওপর হানা দেব এবং সবাইকে হত্যা করব। এরপর তার হত্যার দাবীদার তদন্ত করলে আমরা বলে দেব, আমরা তো তাকে হত্যা করিনি এবং কাউকে হত্যা করতেও দেখিনি। একথায় আমরা সত্যবাদী গণ্য হব। কারণ, রাতের অন্ধকারে কে কাকে মেরেছে, তা আমরা নির্দিষ্ট করে জানবো না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাফিরদের এই স্বনামখ্যাত বাছাই করা বদমায়েশেরা কুফর, শিরক, হত্যা ও লুণ্ঠনের অপরাধ নির্বিবাদে করে যাচ্ছে কোন চিন্তা ছাড়াই, কিন্তু এখানে এ চিন্তা তারাও করেছে যে, তারা যেন মিথ্যা না বলে এবং তারা যেন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হয়। এ থেকে অনুমান করুন যে, মিথ্যা কত বড় গোনাহ্। বড় বড় অপরাধীরাও আত্মসম্মান রক্ষার্থে মিথ্যা বলত না। আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যে ব্যক্তিকে তারা সালেহ্ (আ)-এর ওলী তথা দাবীদার বলেছে, সে তো সালেহ্ (আ)-এরই পরিবারভুক্ত ছিল। তাকে তারা হত্যাতালিকার বাইরে কেন রাখল? জওয়াব এই যে, সম্ভবত সে পারিবারিক দিক দিয়ে ওলী ছিল। কিন্তু কাফির ছিল এবং কাফিরদের সাথে সংঘবদ্ধ ছিল। সালেহ্ (আ) ও তাঁর স্বজনদের হত্যার পর সে বংশগত সম্পর্কের কারণে খুনের বদলা দাবী করবে। এটাও সম্ভবপর যে, সে

মুসলমান ছিল, কিন্তু প্রভাবশালী হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করলে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিত। তাই তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن
قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ
الْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ
اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

(৫৪) স্মরণ কর লূতের কথা, তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন, তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছ? অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত আছ! (৫৫) তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায়। (৫৬) উত্তরে তাঁর কওম শুধু এ কথাটিই বললো, 'লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক, যারা শুধু পাক পবিত্র সাজতে চায়। (৫৭) অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম তাঁর স্ত্রী ছাড়া। কেননা, তার জন্য ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্যই নির্ধারিত করেছিলাম। (৫৮) আর তাদের ওপর বর্ষণ করেছিলাম মুষলধারে বৃষ্টি! সেই সতর্ককৃতদের উপর কতই না মারাত্মক ছিল সে বৃষ্টি! (৫৯) বল, সকল প্রশংসাই আল্লাহ্‌র এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি। শ্রেষ্ঠ কে! আল্লাহ্, না ওরা—তারা যাদেরকে শরীর সাব্যস্ত করে!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (আমি) লূত (আ)-কে (পয়গম্বর করে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম।) যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি জেনে-শুনে অশ্লীল কাজ কর? (তোমরা এর অনিষ্ট বোঝ না। অতঃপর এই অশ্লীল কাজ বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ) তোমরা কি পুরুষদের সাথে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর নারীদেরকে ছেড়ে? (এর কোন কারণ নেই;) বরং (এ ব্যাপারে) তোমরা (নিছক) মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছ। তাঁর সম্প্রদায় (এই বক্তব্যের) কোন (যুক্তিসঙ্গত) জওয়াব দিতে পারল না—এ কথা

ছাড়া যে, তারা পরস্পরে বলল লূত (আ)-এর লোকদেরকে (অর্থাৎ তাঁকে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীগণকে) তোমরা তোমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কৃত কর। (কেননা) তারা বড় পাক-পবিত্র সাজতে চায়। অতঃপর (যখন ব্যাপার এতদূর গড়াল তখন) আমি (তাদের প্রতি আযাব নাযিল করলাম এবং লূতকে ও তাঁর জনদেরকে (এই আযাব থেকে) উদ্ধার করলাম তাঁর স্ত্রী ব্যতীত। তাকে (ঈমান না আনার কারণে (আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত-দের মধ্যে অবধারিত করে রেখেছিলাম। (তাদের আযাব ছিল এই যে) আমি তাদের ওপর নতুন একপ্রকার বৃষ্টি বর্ষণ করলাম (অর্থাৎ প্রস্তর বৃষ্টি)। অতঃপর তাদের প্রতি বর্ষিত বৃষ্টি কত মন্দ ছিল, যাদেরকে (পূর্বে আযাব থেকে) ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। তারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি। আপনি (তওহীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভূমিকাস্বরূপ) বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য (উপযোগী), এবং তাঁর সেই বান্দাগণের প্রতি শান্তি (অবতীর্ণ) হোক, যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন। (অর্থাৎ নবী ও নেককার বান্দাগণের প্রতি। অতঃপর তওহীদের বিষয় বর্ণিত হচ্ছেঃ আপনি আমার তরফ থেকে বর্ণনা করুন এবং লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তোমরাই বল তো, মহিমা-মাহাত্ম্যে এবং অনুগ্রহে) আল্লাহ্ তা'আলাই উত্তম—না সে সকল পদার্থ (উত্তম) যাদেরকে (ইবাদতের যোগ্য মনে করে) আল্লাহ্ তা'আলার শরীক সাব্যস্ত করছ! (মোটকথা, এটা সর্ববাদিসম্মত সত্য যে. আল্লাহ্ তা'আলাই উত্তম। সেমতে উপাস্য হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন একমাত্র তিনিই। অধিকন্তু দয়া ও ক্ষমতায় আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব কাফি-ররাও স্বীকার করতো। সুতরাং সকল কিছু থেকে শ্রেষ্ঠতর হওয়ার কারণে যে তিনিই ইবাদত-আরাধনা করার একমাত্র যোগ্য সত্তা, তা সাধারণ জ্ঞানেও ধরা পড়ে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই কাহিনী সম্পর্কে কোরআনের একাধিক জায়গায় বিশেষ করে সূরা আ'রাফে জরুরী বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই বাক্যে রসূলে করীম (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কারণ, আপনার উম্মতকে দুনিয়ার ব্যাপক আযাব থেকে নিরাপদ করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও আল্লাহ্র মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করুন। অধিকাংশ তফসীরবিদ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। কারও কারও মতে এই বাক্যটিও লূত (আ)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আয়াতে الَّذِينَ اصْطَفٰى বাক্যে বাহ্যত পয়গম্বরগণকেই বোঝানো হয়েছে; যেমন অন্য আয়াতে وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ বলা হয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে

যে, এখানে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে বোঝানো হয়েছে। সুফিয়ান সওরী এ মতই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতে اَلَّذِيْنَ اصْطَفٰى বলে সাহাবায়ে-কিরামকে বোঝানো হলে এই আয়াত দ্বারা পয়গম্বরগণ ছাড়া অন্যদেরকে সালাম বলার জন্য 'আলায়হিস সালাম' বলার বৈধতা প্রমাণিত হয়। সূরা আহযাবের صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا আয়াতের তফসীরে ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হবে।

মাস'আলা ঃ এই আয়াত থেকে খোতবার রীতিনীতিও প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও পয়গম্বরগণের প্রতি দরূদ ও সালাম দ্বারা খোতবা শুরু হওয়া উচিত। রসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে-কিরামের সকল খোতবা এভাবেই শুরু হয়েছে। বরং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি দরূদ ও সালাম সুন্নত ও মোস্তাহাব।—(রূহুল মা'আনী)

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَنْۢبَتْنَا
بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ
بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ۝ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ
اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ
اللّٰهِ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ
السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝
اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا
بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝
اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۗ ءَاِلٰهٌ
مَّعَ اللّٰهِ ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(৬০) বল তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেছেন পানি; অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই। অতএব আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তারা সত্য বিচ্যুত সম্প্রদায়। (৬১) বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদনদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থির রাখার জন্য পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। (৬২) বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন, সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর। (৬৩) বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন? অতএব আল্লাহ্‌র অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে অনেক উর্ধ্বে। (৬৪) বল তো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও মর্ত্য থেকে রিযিক দান করেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে বলা হয়েছিল, آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ---অর্থাৎ আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ, না সেইসব প্রতিমা ইত্যাদি, যাদেরকে তারা আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করে? এটা মুশরিকদের নির্বুদ্ধিতা বরং বক্রবুদ্ধিতার সমালোচনা ছিল। এরপর তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হচ্ছেঃ লোকসকল তোমরা বল,) না তিনি (শ্রেষ্ঠ), যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি, (নতুবা) তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করা তোমাদের দ্বারা সম্ভবপর ছিল না। (একথা শুনে এখন বল,) আল্লাহ্‌র সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার যোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি? (কিন্তু মুশরিকরা এর পরও মানে না,) বরং তারা এমন সম্প্রদায়, যারা (অপরকে) আল্লাহ্‌র সমতুল্য সাব্যস্ত করে। (আচ্ছা, এরপর আরও গুণাবলী শুনে বলল যে, এসব প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, যিনি পৃথিবীকে (সৃষ্ট জীবের) বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তার (অর্থাৎ তাকে স্থির রাখার) জন্য পর্বত স্থাপন করেছেন (যেমন সূরা ফুরকানে مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ বলা হয়েছে। এখন বল,) আল্লাহ্‌র সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার যোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি? (কিন্তু মুশরিকরা মানে না,)

বরং তাদের অধিকাংশই (ভালরূপে) বোঝে না। (আচ্ছা, আরও গুণাবলী শুনে বল যে, এসব প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, যিনি নিঃসহায়ের দোয়া শ্রবণ করেন যখন সে তাঁর কাছে দোয়া করে এবং (তার) কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন করেন। (একথা শুনে এখন বল,) আল্লাহ্‌র সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার যোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি? (কিন্তু) তোমরা অতি সামান্যই স্মরণ রাখ। (আচ্ছা, আরও গুণাবলী শুনে বল যে, এই প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থল ও জলের অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি বৃষ্টির প্রাক্কালে বায়ু প্রেরণ করেন, যে (বৃষ্টির আশা দিয়ে মনকে) আনন্দিত করে। (একথা শুনে এখন বল,) আল্লাহ্‌র সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার জন্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি? (কখনই নয়,) বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শিরক থেকে উর্ধ্বে। (আচ্ছা, আরও গুণ ও অনুগ্রহ শুনে বল যে, এই প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, যিনি সৃষ্ট জীবকে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং যিনি আকাশ ও মর্ত্য থেকে (বৃষ্টি বর্ষণ করে ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করে) তোমাদেরকে রিযিক দান করেন। (একথা শুনে এখন বল,) আল্লাহ্‌র সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার যোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি? (যদি তারা একথা শুনেও বলে যে, অন্য কোন উপাস্য ও ইবাদতের যোগ্য আছে, তবে) আপনি বলুন, (আচ্ছা) তোমরা (তাদের ইবাদতের যোগ্যতার ওপর) তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর. যদি তোমরা এ (দাবিতে) সত্যবাদী হও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ—مضطر শব্দটি اضطرار থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন অভাব হেতু অপারক ও অস্থির হওয়া। এটা তখনই হয়, যখন কোন হিতকামী, সাহায্যকারী ও সহায় না থাকে। কাজেই এমন ব্যক্তিকে مضطر বলা হয়, যে দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকেই সাহায্যকারী মনে করে এবং তাঁর প্রতি মনোযোগী হয়। এই তফসীর সুদ্দী, যুন্নূন মিসরী, সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী) রসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ অসহায় ব্যক্তিকে নিম্নরূপ ভাষায় দোয়া করতে বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْا فَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّاَصْلِحْ لِيْ شَاْنِيْ كُلَّهٗ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ ইয়া আল্লাহ্, আমি আপনার রহমত আশা করি। অতএব আমাকে মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের কাছে সমর্পণ করো না। তুমিই আমার সবকিছু ঠিক-ঠাক করে দাও। তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।—(কুরতুবী)

নিঃসহায়ের দোয়া একান্ত আন্তরিকতার কারণে অবশ্যই কবুল হয়ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নিঃসহায়ের দোয়া কবুল করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণাও করেছেন। এর আসল কারণ এই যে, দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ এবং সম্পর্কাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই কার্যোদ্ধারকারী মনে করে দোয়া করা এখলাস। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এখলাসের বিরাট মর্তবা। মু'মিন, কাফির, পরহেযগার ও পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে যার কাছ থেকেই এখলাস পাওয়া যায়, তার প্রতিই আল্লাহ্র রহমত নিবিষ্ট হয়। এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তারা যখন নৌকায় সওয়ার হয়ে সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করে এবং চতুর্দিক থেকে প্রবল ঢেউয়ের চাপে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন তারা যেন মৃত্যুকে চোখের সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পায়। সেই সময় তারা পূর্ণ এখলাস সহকারে আল্লাহ্কে ডেকে বলে, আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দোয়া কবুল করে যখন তাদেরকে স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তারা পুনরায় শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। (فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا থেকে دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هُمْ يُشْرِكُوْنَ পর্যন্ত আয়াত) এক সহীহ্ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয়—এতে কোন সন্দেহ নেই। এক. উৎপীড়িতের দোয়া, দুই. মুসাফিরের দোয়া এবং তিন. সন্তানদের জন্য বদদোয়া। ইমাম কুরতুবী এই হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন, এই দোয়াত্রয়ের মধ্যেও কবুল হওয়ার পূর্বোক্ত কারণ অসহায়ত্ব বিদ্যমান আছে। কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি যখন দুনিয়ার সব সহায় ও সাহায্যকারী থেকে নিরাশ হয়ে উৎপীড়ন দূর করার জন্য আল্লাহ্কে ডাকে, তখন সে-ও নিঃসহায়ই হয়ে থাকে। এমনিভাবে মুসাফির সফর অবস্থায় তার আত্মীয়স্বজন, প্রিয়জন ও দরদী স্বজনদের কাছ থেকে পৃথক থাকার কারণে নিঃসহায় হয়ে থাকে। পিতা সন্তানদের জন্য পিতৃসুলভ স্নেহ-মমতা ও বাৎসল্যের কারণে কখনও বদদোয়া করতে পারে না, যে পর্যন্ত তার মন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে না যায় এবং নিজেকে সত্যিকার বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ্কে ডাকে। হাদীসবিদ আজেরী হযরত আবূ যর (রা)-এর জবানী রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ আল্লাহ্র উক্তি এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া কখনও রদ করব না, যদিও সে কাফির হয়।—(কুরতুবী) যদি কোন নিঃসহায়, মজলুম; মুসাফির অনুভব করে যে, তার দোয়া কবুল হয় নি, তবে কুধারণার বশবর্তী ও নিরাশ না হওয়া উচিত। কারণ, মাঝে মাঝে দোয়া কবুল হলেও রহস্য ও উপকারিতাবশত দেরিতে প্রকাশ পায়। অথবা তার উচিত নিজের অবস্থা যাচাই করা যে, তার এখলাস ও আল্লাহ্র প্রতি মনোযোগে কোন ত্রুটি আছে কি না।

واللّٰه اعلم

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۭ وَمَا يَشْعُرُوْنَ
اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۝ بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۣ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۣ
بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَاۗؤُنَآ اَىِٕنَّا
لَمُخْرَجُوْنَ ۝ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَاۗؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ
اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُجْرِمِيْنَ ۝ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۝ وَيَقُوْلُوْنَ
مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ
بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَي النَّاسِ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝
وَمَا مِنْ غَاۗئِبَةٍ فِي السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

(৬৫) বলুন, আল্লাহ্‌ ব্যতীত নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে কেউ গায়েবের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে। (৬৬) বরং পরকাল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছে বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ। (৬৭) কাফিররা বলে, যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা মৃত্তিকা হয়ে যাবে, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? (৬৮) এই ওয়াদা প্রাপ্ত হয়েছি আমরা এবং পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ কিছু নয়। (৬৯) বলুন, পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে। (৭০) তাদের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না এবং তারা যে চক্রান্ত করেছে এতে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। (৭১) তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে? (৭২) বলুন অসম্ভব কি, তোমরা যত দ্রুত কামনা করছ তাদের কিয়দংশ তোমাদের পিঠের ওপর এসে গেছে। (৭৩) আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৭৪) তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে আপনার পালনকর্তা অবশ্যই তা জানেন। (৭৫) আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন ভেদ নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে না আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ নবুয়তের পর তওহীদের বিষয় আলোচিত হয়েছে। অতপর কিয়ামত ও পরকালের কথা বলা হচ্ছে। তওহীদের প্রমাণাদিতে ثُمَّ يُعِيدُهُ বলে এর প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিতও করা হয়েছিল। যে যে কারণবশত কাফিররা কিয়ামতকে অবাস্তব বলত, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় জিজ্ঞাসা করলেও বলা হয় না। এ থেকে বোঝা যায় যে, এটা কোন কিছুই না। অর্থাৎ তারা অনির্ধারণকে অবাস্তবতার প্রমাণ মনে করত। তাই এই বিষয়বস্তুকে এভাবে শুরু করা হয়েছে যে, গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন قُلْ لَّا يَعْلَمُ الخ (এতে তাদের সন্দেহের জওয়াবও হয়ে গেছে।) কিয়ামত কবে হবে, এ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এরপর بَلِ ادّٰرَكَ বলে তাদের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে (وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) অতঃপর قُلْ سِيْرُوْا বলে অস্বীকারের কারণে শাসানো হয়েছে এবং এই অস্বীকারের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে لَا تَحْزَنْ বলে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে। অতঃপর وَيَقُوْلُوْنَ বলে শাসানো সম্পর্কে তাদের একটি সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছে এবং اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ বলে শাসানোর তাকীদ করা হয়েছে।

(তারা কিয়ামতের সময় নির্ধারণ না করাকে কিয়ামত না হওয়ার প্রমাণ মনে করে। এর জওয়াবে) আপনি বলুন, (এই প্রমাণ ভ্রান্ত। কেননা, এ থেকে অধিক পক্ষে এতটুকু জরুরী যে, আমার ও তোমাদের কাছে এর নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান অনুপস্থিত। সুতরাং এ ব্যাপারে এরই কি বিশেষত্ব? অদৃশ্য ও অনুপস্থিত বিষয় সম্পর্কে তো সামগ্রিক নীতি এই যে,) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের (অর্থাৎ বিশ্ব জগতের) কেউ গায়েবের খবর জানে না আল্লাহ্ ব্যতীত এবং (এ কারণেই) তারা (এ খবরও) জানে না যে, তারা কখন পুনরুত্থিত হবে। (অর্থাৎ আল্লাহ্-তা'আলা তো বলা ছাড়াই সব কিছু জানেন এবং অন্য কেউ বলা ছাড়া কিছুই জানে না। কিন্তু দেখা যায় যে, অনেক বিষয় পূর্বে জানা না থাকলেও সেগুলো বাস্তবে পরিণত হয়। এতে জানা গেল যে, কোন বিষয় জানা না থাকলে তার অস্তিত্বহীনতা জরুরী হয়ে পড়ে না। আসল ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রহস্যের কারণে কোন কোন বিষয়ের জ্ঞান যবনিকার অন্তরালে রাখতে চান। কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময়ও এসব বিষয়ের অন্যতম। তাই মানুষকে এর জ্ঞান দান করা হয় নি। এতে এর অবাস্তবতা কিরূপে জরুরী হয়?

সঠিক সময়ের জ্ঞান না থাকা সবার পক্ষেই অভিন্ন বিষয়। কিন্তু অবিশ্বাসী কাফিররা শুধু নির্দিষ্টভাবে কিয়ামতকেই অমান্য করে না) বরং (তদুপরি) পরকাল সম্পর্কে তাদের (মূল) জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে। (অর্থাৎ স্বয়ং পরকালের বাস্তবতা সম্পর্কেই তারা জ্ঞান রাখে না, যা নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান না থাকার চাইতেও গুরুতর) বরং (তদুপরি) তারা এ বিষয়ে (অর্থাৎ বাস্তবতা সম্পর্কে) সন্দিগ্ধ। বরং (তদুপরি) এ বিষয়ে তারা অন্ধ। (অর্থাৎ অন্ধ যেমন পথ দেখে না, ফলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছা অসম্ভব হয়, তেমনি তারা চূড়ান্ত হঠকারিতার কারণে পরকালের সত্যতায় বিশুদ্ধ প্রমাণাদি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনাই করে না, ফলে প্রমাণাদি তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, যদ্দ্বারা উদ্দিষ্ট বিষয় পর্যন্ত পৌঁছার আশা করা যেত। সুতরাং এটা সন্দেহের চাইতেও গুরুতর। কারণ, সন্দিগ্ধ ব্যক্তি মাঝে মাঝে প্রমাণাদি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে সন্দেহ দূর করে নেয়। তারা চিন্তাভাবনাই করে না। কাফিরদের এই বিরূপ সমালোচনার পর সম্মুখে তাদের একটি অবিশ্বাসমূলক উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে) কাফিররা বলে, যখন আমরা (মরে) মৃত্তিকা হয়ে যাব এবং (এমনিভাবে) আমাদের পিতৃপুরুষরাও, তখনও কি আমাদেরকে (কবর থেকে) পুনরুত্থিত করা হবে? এই ওয়াদা প্রাপ্ত হয়েছি আমরা এবং (মুহাম্মাদের) পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। (কারণ, সব পয়গম্বরের এই উক্তি সুবিদিত। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা হয় নি এবং কবে হবে তাও কেউ বলে নি। এ থেকে জানা যায় যে,) এগুলো পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে বর্ণিত ভিত্তিহীন কথাবার্তা। আপনি বলে দিন, (যখন এর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ এবং বাস্তবতা সম্পর্কে ইতিহাসগত প্রমাণাদি স্থানে স্থানে বারবার তোমাদেরকে শোনানো হয়েছে, তখন একে মিথ্যারোপ করা থেকে তোমাদের বিরত হওয়া উচিত। নতুবা অন্য মিথ্যারোপকারীদের যে অবস্থা হয়েছে অর্থাৎ আযাবে পতিত হয়েছে, তোমাদেরও তাই হবে। যদি তাদের দুরবস্থা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ হয়ে থাকে তবে) তোমাদের পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কি হয়েছে। (কারণ তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া এবং আযাব আসার চিহ্ন এখন পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে। এ সব সারগর্ভ উপদেশ সত্ত্বেও যদি তারা বিরোধিতাই করে যায়, তবে) তাদের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না এবং তারা যে চক্রান্ত করেছে, তজ্জন্যে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। (কারণ, অন্যান্য পয়গম্বরের সাথেও এরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। قُلْ سِيرُوا আয়াতে এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে তাদেরকে যে শাস্তিবাণী শোনানো হয়, এতদসত্ত্বেও তাদের অন্তরে ঈমান থাকার কারণে) তারা (নির্ভীকভাবে) বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে এই (আযাব ও গযবের) ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে? আপনি বলুন, অসম্ভব কি, তোমরা যে আযাব দ্রুত কামনা করছ, তার কিয়দংশ তোমাদের নিকটেই পৌঁছে গেছে। (তবে এখন পর্যন্ত দেরি হওয়ার কারণ এই যে,) আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল (এই ব্যাপক অনুগ্রহের কারণে কিছুটা অবকাশ দিয়ে রেখেছেন) কিন্তু তাদের অধিকাংশই (এ জন্যে) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না (যে, বিলম্বকে সুযোগ মনে করে এতে সত্য অন্বেষণ করবে। এভাবে তারা আযাব থেকে

চিরমুক্তি পেতে পারত। বরং তারা উল্টা অবিশ্বাস ও পরিহাসের ভঙ্গিতে দ্রুত আযাব কামনা করছে। এই বিলম্ব যেহেতু উপকারিতাবশত তাই এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, এসব কর্মের শাস্তিই হবে না। কেননা) তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, আপনার পালনকর্তা অবশ্যই জানেন। (এটা শুধু আল্লাহ্‌র জানাই নয়, বরং আল্লাহ্‌র দফতরে লিখিত আছে। তাতে শুধু তাদের ক্রিয়া কর্মই নয়, বরং) আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন ভেদ নেই, যা লওহে মাহফুযে না আছে। (এই লওহে মাহফুযে আল্লাহ্ তা'আলার দফতর। কেউ জানে না, এমন সব গোপন-ভেদ যখন তাতে বিদ্যমান আছে, তখন বাহ্যিক বিষয়সমূহ আরও উত্তমরূপে বিদ্যমান রয়েছে। মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কুকর্ম অবগত আছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার দফতরেও সংরক্ষিত আছে। এ সব কুকর্ম সাজার দাবিদারও। সাজা যে বাস্তব রূপ লাভ করবে এ সম্পর্কে পয়গম্বরগণ প্রদত্ত সত্য সংবাদগুলোও একমত ও অভিন্ন। এমতাবস্থায় সাজা হবে না—এরূপ বোঝার অবকাশ আছে কি? তবে বিলম্ব হওয়া সম্ভবপর। সেমতে অবিশ্বাসীদের কতক শাস্তি দুনিয়াতেও হয়েছে; যেমন দুর্ভিক্ষ, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি। কিছু কবরে ও বরযখে হবে, যা বেশি দূরে নয় এবং কিছু পরকালে হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ—রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদেরকে বলে দিন, যত মখলুক আকাশে আছে; যেমন ফেরেশতা, যত মখলুক পৃথিবীতে আছে; যেমন মানবজাতি, জিন জাতি ইত্যাদি—তাদের কেউ গায়েবের খবর জানে না, আল্লাহ্ ব্যতীত। আলোচ্য আয়াত পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরিষ্কারভাবে এ কথা ব্যক্ত করেছে যে গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ—এতে কোন ফেরেশতা অথবা নবী-রসূলও শরীক হতে পারে না। এ বিষয়ের জরুরী ব্যাখ্যা সূরা আন-'আমের ৫৯ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ

ادارک শব্দে বিভিন্ন রূপের কেরাআতও আছে এবং এর অর্থ সম্পর্কেও নানাজনের নানা উক্তি রয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ তফসীরের কিতাবাদিতে এর বিবরণ দেখে নিতে পারেন। এখানে এতটুকু বুঝে নেয়া যথেষ্ট যে, কোন কোন তফসীরকারক ادارک শব্দের অর্থ নিয়েছেন تکامل অর্থাৎ পরিপূর্ণ হওয়া এবং فی الاخرة কে ادارک এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করেছেন যে, পরকালের এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, তখন প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে সামনে এসে যাবে। তবে তখনকার জ্ঞান তাদের কোন কাজে লাগবে না। কারণ, দুনিয়াতে

তারা পরকালকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করত। পক্ষান্তরে কোন কোন তফসীরকারকের মতে ادارك শব্দের অর্থ ضل ও غاب এবং فى الاخرة শব্দটি علمهم -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ পরকালের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান উধাও হয়ে গেছে। তারা একে বুঝতে পারে নি।

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝٧٦
وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝٧٧ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝٧٨ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝٧٩

---

(৭৬) এই কোরআন বনী ইসরাঈল যে সব বিষয়ে মতবিরোধ করে, তার অধিকাংশ তাদের কাছে বর্ণনা করে। (৭৭) এবং নিশ্চিতই এটা মু'মিনদের জন্য হিদায়ত ও রহমত। (৭৮) আপনার পালনকর্তা নিজ শাসনক্ষমতা অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ। (৭৯) অতএব আপনি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় এই কোরআন বনী ইসরাঈল যেসব বিষয়ে মতভেদ করে, তার অধিকাংশ (অর্থাৎ অধিকাংশের স্বরূপ) তাদের কাছে বিবৃত করে এবং এটা মু'মিনদের জন্য (বিশেষ) হিদায়ত ও (বিশেষ) রহমত। (ইবাদত ও কর্মের ক্ষেত্রে হিদায়ত এবং ফলাফলও পরিণামের ক্ষেত্রে রহমত)। নিশ্চিতই আপনার পালনকর্তা নিজ বিচার অনুযায়ী (কার্যত) ফয়সালা তাদের মধ্যে (কিয়ামতের দিন) করবেন। (তখন জানা যাবে কোন্‌টি সত্য ধর্ম এবং কোন্‌টি মিথ্যা ধর্ম ছিল। অতএব তাদের জন্য পরিতাপ কিসের) তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। (তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কেউ কারও ক্ষতি করতে পারে না।) অতএব আপনি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করুন (আল্লাহ্ অবশ্যই সাহায্য করবেন। কেননা) আপনি সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণিত করে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের বাস্তবতা এবং তাতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন যুক্তির নিরিখে সম্ভবপর। এতে কোন যুক্তিগত জটিলতা নেই। যৌক্তিক সম্ভাব্যতার সাথে এর অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা পয়গম্বরগণের ও ঐশী কিতাবাদির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। বর্ণনাকারী সত্যবাদিতার উপর সংবাদের বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য হওয়া নির্ভরশীল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এর সংবাদদাতা কোরআন এবং কোরআনের

সত্যবাদিতা অনস্বীকার্য। এমন কি, বনী ইসরাঈলের আলিমদের মধ্যে যে সব বিষয়ে কঠোর মতবিরোধ ছিল এবং যার মীমাংসা ছিল সুদূরপরাহত কোরআনপাক সেসব বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ ফয়সালার পথ নির্দেশ করেছে। বলা বাহুল্য, যে আলিমদের মতবিরোধে বিচার-বিশ্লেষণ ও ফয়সালা করে তার সর্বাধিক জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ হওয়া নেহায়েত জরুরী। এতে বোঝা গেল যে, কোরআন সর্বাধিক জ্ঞান-সম্পন্ন এবং সত্যবাদী সংবাদদাতা। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা) -এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের বিরোধিতায় মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং আপনার ফয়সালা করবেন। আপনি আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখুন। কেননা, আল্লাহ্ সত্যকে সাহায্য করেন এবং আপনি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তা নিশ্চিত।

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

(৮০) আপনি আহবান শোনাতে পারবেন না মৃতদেরকে এবং বধিরকেও নয়, যখন তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়। (৮১) আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরিয়ে সৎপথে আনতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরকে শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। অতএব তারাই আজ্ঞাবহ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি মৃতদেরকে ও বধিরদেরকে আপনার আওয়াজ শোনাতে পারবেন না। (বিশেষ করে) যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে (ফিরিয়ে) সৎপথ দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরকেই শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস রাখে (এবং) এরপর তারা মান্য (ও) করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সমগ্র মানব জাতির প্রতি আমাদের রসূলে করীম (সা)-এর স্নেহ মমতা ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, তিনি সবাইকে আল্লাহ্র পয়গাম শুনিয়ে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে নেবেন। কেউ তাঁর এই পয়গাম কবূল না করলে তিনি নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিত হতেন, যেমন কারও সন্তান তার কথা অমান্য করে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাই কোরআন পাক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী

আয়াতসমূহে وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ এবং وَلَا تَحْزَنْ বাক্যসমূহ এই সান্ত্বনা প্রদান সম্পর্কিত শিরোনামই ছিল। আলোচ্য আয়াতেও সান্ত্বনার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি সত্যের পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। যারা এই পয়গাম কবূল করেনি, তাতে আপনার কোন দোষ ও ত্রুটি নেই, যদ্দরুন আপনি দুঃখিত হবেন ; বরং তারা কবূল করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের যোগ্যতাহীনতাকে তিনটি উদাহরণ দ্বারা সপ্রমাণ করা হয়েছে। এক, তারা সত্য কবূল করার ব্যাপারে পুরোপুরি মৃতদেহের অনুরূপ। মৃতদেহ কারও কথা শুনে লাভবান হতে পারে না। দুই, তাদের উদাহরণ বধিরের মত, যে বধির হওয়ার সাথে সাথে শুনতেও অনিচ্ছুক। কেউ তাকে কিছু শোনাতে চাইলে সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। তিন, তারা অন্ধের মত। অন্ধকে কেউ পথ দেখাতে চাইলেও সে দেখতে পারে না। এই তিনটি উদাহরণ বর্ণনা করার পর পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ

إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ — অর্থাৎ আপনি তো কেবল তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে এবং আনুগত্য গ্রহণ করে। এই পূর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে শোনা ও শোনানোর অর্থ নিছক কানে আওয়াজ পৌঁছা নয়; বরং এর অর্থ এমন শোনা, যা ফলপ্রদ হয়। যে শ্রবণ ফলপ্রদ নয়, কোরআন উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তাকে বধিরতারূপে ব্যক্ত করেছে। আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে—আয়াতের এই বাক্য যদি শোনানোর অর্থ কেবল কানে আওয়াজ পৌঁছানোই হত, তবে কোরআনের এই উক্তি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা বিরোধী হয়ে যেত। কেননা, কাফিরদের কানে আওয়াজ পৌঁছানো এবং তাদের শ্রবণ ও জওয়াব দেওয়ার প্রমাণ অসংখ্য। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখানে ফলদায়ক শ্রবণ বোঝানো হয়েছে। তাদেরকে মৃতদেহের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। এর অর্থও এই যে, মৃতরা যদি কোন সত্য কথা শুনেও ফেলে এবং তখন তা কবূলও করতে চায়, তবে এটা তাদের জন্য উপকারী নয়। কেননা, তারা দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে চলে গেছে। এখানে ঈমান ও কর্ম উপকারী হতে পারত। মৃত্যুর পর বরযখ ও হাশরের ময়দানে তো সব কাফিরই ঈমান ও সৎকর্মের বাসনা প্রকাশ করবে। কিন্তু সেটা ঈমান ও কর্ম গৃহীত হওয়ার সময় নয়। কাজেই আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, মৃতরা কারও কোন কথা শুনতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে এই আয়াত নিশ্চুপ। মৃতরা কারও কথা শুনতে পারে কি না, এটা স্বস্থানে লক্ষণীয় বিষয় বটে।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রা) যেসব বিষয়ে পরস্পরে মতভেদ করেছেন, মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি সেগুলোর অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) মৃতদের শ্রবণ প্রামাণ্য সাব্যস্ত করেন। হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) এর বিপরীত বলেন যে, মৃতরা শ্রবণ করতে পারে না। এ কারণেই অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কোরআন পাকে প্রথমত এই সূরা নাম্‌লে এবং দ্বিতীয়ত সূরা রুমে প্রায় একই ভাষায় এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতিরে বিষয়টি এভাবে বিধৃত হয়েছে ঃ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ——অর্থাৎ যারা কবরস্থ হয়ে গেছে, তাদেরকে আপনি শোনাতে পারবেন না।

এই আয়াতত্রয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন আয়াতেই এরূপ বলা হয়নি যে, মৃতরা শুনতে পারবে না; তিনটি আয়াতেই বলা হয়েছে যে, মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। তিনটি আয়াতেই এভাবে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা থাকতে পারলেও আমরা নিজেদের ক্ষমতাবলে তাদেরকে শোনাতে পারি না।

এই আয়াতত্রয়ের বিপরীতে শহীদদের সম্পর্কে একটি চতুর্থ আয়াত একথা প্রমাণ করে যে, শহীদগণ তাদের কবরে বিশেষ এক প্রকার জীবন লাভ করেন এবং সেই জীবন উপযোগী জীবনোপকরণও তাঁরা প্রাপ্ত হন। তাঁদের জীবিত আত্মীয়স্বজনদের সম্পর্কেও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সুসংবাদ শোনানো হয়। আয়াত এই ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকতে পারে। শহীদদের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতার সাক্ষ্যও এই আয়াত দিচ্ছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটা তো বিশেষভাবে শহীদদের জন্য প্রযোজ্য——সাধারণ মৃতদের জন্য নয়——তবে এর জওয়াব এই যে, এই আয়াত দ্বারা কমপক্ষে এতটুকু তো সপ্রমাণ হয়েছে যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা, অনুভূতি ও এ জগতের সাথে সম্পর্ক বাকি থাকতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা শহীদদেরকে যেমন এই মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁদের আত্মার সম্পর্ক দেহ ও কবরের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করবেন, অন্যান্য মৃতকেও এই সুযোগ দিতে পারবেন।

মৃতদের শ্রবণের মত দানের প্রবক্তা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের উক্তিও একটি
সহীহ্ হাদীসের ওপর ভিত্তিশীল। হাদীস এইঃ

ما من احد يمر بقبر اخيه المسلم كان يعرفه فى الدنيا فيسلم
عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরিচিত কোন মুসলমান ভাইয়ের কবরের কাছ দিয়ে গমন
করে, অতপর তাকে সালাম করে, আল্লাহ্ তা'আলা সেই মৃত মুসলমানের আত্মা তার
মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়ে দেন, যাতে সে সালামের জওয়াব দেয়।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি তার মৃত মুসলমান ভাইয়ের
কবরে গিয়ে সালাম করলে সে তার সালাম শোনে এবং জওয়াব দেয়। এটা এভাবে
হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তখন তার আত্মা দুনিয়াতে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এতে দু'টি
বিষয় প্রমাণিত হল। এক. মৃতরা শুনতে পারে এবং দুই তাদের শোনা এবং আমাদের
শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, শুনিয়ে
দেন। এই হাদীসে বলেছে যে, মুসলমানের সালাম করার সময় আল্লাহ্ তা'আলা মৃতের
আত্মা ফেরত এনে সালাম শুনিয়ে দেন এবং তাকে সালামের জওয়াব দেওয়ারও শক্তি
দান করেন। এ ছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে অকাট্য ফয়সালা করা যায়
না যে, মৃতরা সেগুলো শুনবে কি না। তাই ইমাম গাযযালী ও আল্লামা সুবকী প্রমুখের
সুচিন্তিত অভিমত এই যে, সহীহ্ হাদীস ও উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো
প্রমাণিত যে, মাঝে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথাবার্তা শোনে; কিন্তু এর কোন প্রমাণ
নেই যে, প্রত্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই শোনে। এভাবে আয়াত ও
রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। এটা সম্ভবপর যে, মৃতরা
এক সময়ে জীবিতদের কথাবার্তা শোনে এবং অন্য সময় শুনতে পারে না। এটাও সম্ভব
যে, কতক লোকের কথা শোনে এবং কতক লোকের শোনে না অথবা কতক মৃত শোনে
এবং কতক মৃত শোনে না। কেননা, সূরা নামল, সূরা রূম ও সূরা ফাতিরের আয়াত
দ্বারাও একথা প্রমাণিত যে, মৃতদেরকে শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়; বরং আল্লাহ্
যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে দেন। তাই যে যে ক্ষেত্রে সহীহ্ হাদীস দ্বারা শ্রবণ প্রমাণিত আছে,
সেখানে শ্রবণের বিশ্বাস রাখা দরকার এবং যেখানে প্রমাণিত নেই, সেখানে উভয় সম্ভাবনা
বিদ্যমান আছে—অকাট্য রূপে শোনে বলারও অবকাশ নেই এবং শোনে না বলারও
সুযোগ নেই।

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

(৮২) যখন ওয়াদা তাদের কাছে এসে যাবে তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন (কিয়ামতের) ওয়াদা তাদের প্রতি পূর্ণ হওয়ার উপক্রম হবে (অর্থাৎ কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হবে) তখন আমি তাদের জন্য ভূগর্ভ থেকে এক (অদ্ভুত) জীব নির্গত করব। সে তাদের সাথে কথাবার্তা বলবে। কেননা, (কাফির) মানুষ আমার (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার) আয়াতসমূহে (বিশেষ করে কিয়ামত সম্পর্কিত আয়াত-সমূহে) বিশ্বাস করতো না। (কিন্তু এখন কিয়ামত এসে গেছে। তার আলামতসমূহের মধ্যে জন্তুর আবির্ভাবও একটি আলামত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ভূগর্ভের জীব কি, কোথায় এবং কবে নির্গত হবে? মসনদে আহমদে হযরত হুযায়ফা (রা)-র বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে পর্যন্ত দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পায়, সেই পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। ১. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া, ২. ধূম্র নির্গত হওয়া, ৩. জীবের আবির্ভাব হওয়া, ৪. ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হওয়া, ৫. ঈসা (আ)-র অবতরণ, ৬. দাজ্জাল, ৭. তিনটি চন্দ্রগ্রহণ—এক. পশ্চিমে, দুই. পূর্বে এবং তিন. আরব উপদ্বীপে, ৮. এক অগ্নি, যা আদন থেকে নির্গত হবে এবং সব মানুষকে হাঁকিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবে। মানুষ যে স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্য অবস্থান করবে, অগ্নিও সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। دَابَّة শব্দের تَنْوِين -এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জন্তুটি অদ্ভুত আকৃতি বিশিষ্ট হবে। আরও জানা যায় যে, এই জীবটি সাধারণ জন্তুদের প্রজনন প্রক্রিয়া মুতাবেক জন্মগ্রহণ করবে না; বরং অকস্মাৎ ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। এই হাদীস থেকে একথাও বোঝা যায় যে, এই আবির্ভাব কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের অন্যতম। এরপর অনতিবিলম্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর, আবূ দাউদ তোয়ালিসার বরাত দিয়ে হযরত তালহা ইবনে উমরের এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, ভূগর্ভের এই জীব মক্কার সাফা পর্বত থেকে নির্গত হবে। সে মস্তকের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে মসজিদে হারামে কৃষ্ণ প্রস্তর ও মকামে ইবরাহীমের মাঝখানে পৌঁছে যাবে। মানুষ একে দেখে পালাতে থাকবে। একদল লোক সেখানেই থেকে যাবে। এই জন্তু তাদের মুখমণ্ডল তারকার ন্যায় উজ্জ্বল করে দেবে। এর পর সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবে এবং প্রত্যেক কাফিরের

মুখমণ্ডলে কুফরের চিহ্ন এঁকে দেবে। কেউ তার নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না। সে প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরকে চিনবে।—(ইবনে কাসীর) মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখে একটি অবিস্মরণীয় হাদীস শ্রবণ করেছি। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। সূর্য উপরে ওঠার পর ভূগর্ভের জীব নির্গত হবে। এই আলামতদ্বয়ের মধ্যে যে-কোন একটি প্রথমে হওয়ার অব্যবহিত পরেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে—(ইবনে কাসীর)

শায়খ জালালুদ্দীন মহল্লী বলেন, জীব নির্গত হওয়ার সময় 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ'-এর বিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এরপর কোন কাফির ইসলাম গ্রহণ করবে না। অনেক হাদীস ও বর্ণনায় এই বিষয়বস্তু পাওয়া যায়।—(মাযহারী) এ স্থলে ইবনে কাসীর প্রমুখ ভূগর্ভের জীবের আকার-আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কোরআনের আয়াত ও সহীহ্ হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, এটা একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব হবে এবং সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। মক্কা মোকাররমায় এর আবির্ভাব হবে, অতপর এ সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করবে। সে কাফির ও মু'মিনকে চিনবে এবং তাদের সাথে কথা বলবে। কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এতটুকু বিষয়েই বিশ্বাস রাখা দরকার। এর অধিক জানার চেষ্টা করা জরুরী নয় এবং তাতে কোন উপকারও নেই।

ভূগর্ভের জীব মানুষের সাথে কথা বলবে, এর অর্থ কি? এই প্রশ্নের জওয়াবে কেউ কেউ বলেন যে, কোরআনে উল্লিখিত বাক্যটিই হবে তার কথা। অর্থাৎ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ এই বাক্যটিই সে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শোনাবে। বাক্যের অর্থ এই ঃ অনেক মানুষ আজকের পূর্বে আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করত না। উদ্দেশ্য এই যে, এখন সেই সময় এসে গেছে। এখন সবাই বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখনকার বিশ্বাস আইনত ধর্তব্য হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত আছে এবং অপর এক রেওয়ায়েতে আলী (রা) থেকেও বর্ণিক আছে যে, এই জীব সাধারণ কথাবার্তার অনুরূপ মানুষের সাথে কথা বলবে। —(ইবনে কাসীর)

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴿٨٥﴾

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن
فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ
دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ
صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾ مَن جَاءَ
بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَن
جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

(৮৩) যেদিন আমি একত্রিত করব একেকটি দলকে সেইসব সম্প্রদায় থেকে, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত; অতপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে। (৮৪) যখন তারা উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিলে? অথচ এগুলো সম্পর্কে তোমাদের পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। না তোমরা অন্য কিছু করছিলে? (৮৫) জুলুমের কারণে তাদের কাছে আযাবের ওয়াদা এসে গেছে। এখন তারা কোন কিছু বলতে পারবে না। (৮৬) তারা কি দেখে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে করেছি আলোকময়। নিশ্চয় এতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৮৭) যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, অতপর আল্লাহ্ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা সবাই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়। (৮৮) তুমি পর্বতমালাকে দেখে অচল মনে কর, অথচ সে-দিন এগুলো মেঘমালার মত চলমান হবে। এটা আল্লাহ্র কারিগরি, যিনি সব কিছুকে করেছেন সুসংহত। তোমরা যা কিছু করছ, তিনি তা অবগত আছেন। (৮৯) যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে এবং সেইদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। (৯০) এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অগ্নিতে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা করছিলে, তারই প্রতিফল তোমরা পাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যেদিন (কবর থেকে জীবিত করার পর) আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে (অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ থেকে এবং এই উম্মত থেকেও) তাদের একটি দল সমবেত করব, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত (অতপর তাদেরকে হাশরের মাঠের দিকে

হিসাবের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। যেহেতু তারা প্রচুর সংখ্যক হবে, তাই) তাদেরকে (চলার পথে পেছনের লোকদের সাথে মিলিত থাকার জন্য) বিরত রাখা হবে, যাতে আগে-পিছে না থাকে—সবাই একসাথ হয়ে হিসাবের মাঠের দিকে চলে। এতে আধিক্য বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কেননা, বড় সমাবেশে স্বভাবতই এরূপ হয়---বাধা প্রদান করা হোক বা না হোক।) যখন (চলতে চলতে তারা হাশরের মাঠে) উপস্থিত হবে, তখন (হিসাব শুরু হয়ে যাবে এবং) আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমরা আমার আয়াত-সমূহকে মিথ্যা বলেছিলে? অথচ তোমরা এগুলোকে তোমাদের জ্ঞানের পরিধিতে আনতে না (যার ফলে চিন্তা করার সুযোগ হত এবং চিন্তা করার পর কোন মতামত কায়েম করতে পারতে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা চিন্তা-ভাবনা না করেই শোনামাত্র সেগুলোকে মিথ্যা বলে দিয়েছিলে এবং শুধু মিথ্যা বলাই নয়;) বরং (স্মরণ করে দেখ, এছাড়া) তোমরা আরও কত কিছু করছিলে। (উদাহরণত পয়গম্বরগণকে ও মু'মিন-গণকে কষ্ট দিয়েছ, যা মিথ্যা বলার চাইতেও গুরুতর অন্যায়। এমনিভাবে আরও অনেক কুফরী বিশ্বাস ও পাপাচারে লিপ্ত ছিলে। এখন) তাদের ওপর (অপরাধ কায়েম হয়ে যাওয়ার কারণে আযাবের) ওয়াদা পূর্ণ হয়ে গেছে (অর্থাৎ শাস্তির যোগ্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে); এ কারণে যে, (দুনিয়াতে) তারা (গুরুতর) সীমা লংঘন করে-ছিল (যা আজ প্রকাশ হয়ে গেছে)। অতএব (যেহেতু প্রমাণ শক্তিশালী, তাই) তারা (ওযর সম্পর্কে) কোন কিছু বলতেও পারবে না। (কোন কোন আয়াতে তাদের ওযর পেশ করার কথা আছে, সেটা প্রথমাবস্থায় হবে। এরপর প্রমাণ কায়েম হয়ে গেলে কেউ কথা বলতে পারবে না। তাদের কিয়ামত অস্বীকার করাটা নিরেট নির্বুদ্ধিতা। কেননা, ইতিহাসগত প্রমাণাদি ছাড়াও এর পক্ষে যুক্তিগত প্রমাণ কায়েম আছে; যেমন) তারা কি দেখে না যে, আমি বিশ্রামের জন্য রাত সৃষ্টি করেছি। (এই বিশ্রাম মৃত্যুর সমতুল্য) এবং দিনকে করেছি আলোকময়। (এটা জাগরণের ওপর নির্ভরশীল। জাগরণ মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের সমতুল্য। সুতরাং) নিশ্চয়ই এতে (অর্থাৎ দৈনন্দিন নিদ্রা ও জাগরণে পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতা এবং আয়াতসমূহের সত্যতার ওপর) বড় বড় প্রমাণ রয়েছে। (কেননা, মৃত্যুর স্বরূপ হচ্ছে আত্মার সম্পর্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং পুনরুজ্জীবনের স্বরূপ হচ্ছে এই সম্পর্ক পুনঃ স্থাপিত হওয়া। নিদ্রাও এক দিক দিয়ে এই সম্পর্কের ছিন্নতা। কারণ, নিদ্রায় এই সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। তার অস্তিত্বের স্তরসমূহের মধ্যে কোন একটি স্তরের বিলুপ্তির ফলেই সম্পর্ক দুর্বল হয়। এই বিলুপ্ত স্তরের পুনরাবর্তনকেই জাগরণ বলা হয়। কাজেই উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। নিদ্রার পর জাগ্রত করতে যে আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম, তা প্রত্যহ আমরা দেখতে পাই। মৃত্যুর পর জীবন দানও এরই নজির। তাতে আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম হবেন না কেন? এই যুক্তি প্রত্যেকের জন্যই। কিন্তু এর দ্বারা উপকার লাভের দিক) তাদের জন্য (ই), যারা ঈমানদার। (কেননা, তারা চিন্তা-ভাবনা করে, অন্যরা করে না। কোন ফল লাভ করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা জরুরী। তাই অন্যরা এর দ্বারা উপকৃত হয় না। হাশরের পূর্বে একটি লোমহর্ষক ঘটনা

ঘটবে। পরবর্তী আয়াতে তা উল্লেখ করা হচ্ছে। এর ভয়াবহতাও স্মর্তব্য ঃ) যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে (এটা প্রথম ফুৎকার। দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে হাশর হবে।) অতঃপর আকাশে ও পৃথিবীতে যারা (ফেরেশতা, মানুষ ইত্যাদি) আছে, তারা সবাই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে (অতপর মৃত্যুবরণ করবে। যারা মৃত্যুবরণ করেছিল, তাদের আত্মা অজ্ঞান হয়ে যাবে) কিন্তু যাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন (সে এই ভীতি ও মৃত্যু থেকে নিরাপদ থাকবে। সহীহ্ হাদীস দৃষ্টে এরা হবেন জিবরাঈল, মীকাঈল, ঈসরাফীল, আযরাঈল এবং আরশ বহনকারীগণ। এরপর ফুৎকারের প্রভাব ছাড়াই তাদেরও ওফাত হয়ে যাবে।—(দুররে মনসুর) আর (দুনিয়াতে ভয়ের বস্তু থেকে পলায়নের অভ্যাস আছে। সেখানে আল্লাহ্র কাছ থেকে কেউ পলায়ন করতে পারবে না; বরং) সকলেই তাঁর কাছে অবনত মস্তকে হাযির থাকবে; (এমন কি জীবিতরা মৃত এবং মৃতরা অজ্ঞান হয়ে যাবে। ফুৎকারের এই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রাণীদের মধ্যে হবে। অতঃপর অপ্রাণীদের ওপর এর কি প্রভাব পড়বে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি (তখন) পর্বতমালাকে (বাহ্যিক দৃঢ়তার কারণে বাহ্যদৃষ্টে) অচল (অর্থাৎ সর্বদা এরূপই থাকবে এবং স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হবে না) মনে কর; অথচ সেইদিন এদের অবস্থা হবে এই যে,) এগুলো মেঘমালার মত (শূন্যগর্ভ, হালকা ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্য পরিমণ্ডলে) চলমান হবে। (যেমন আল্লাহ্ বলেন, وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا —এজন্য আশ্চর্যান্বিত হওয়া উচিত নয় যে, এরূপ ভারী ও কঠোর বস্তুর অবস্থা এরূপ হবে কেমন করে? কারণ এই যে,) এটা আল্লাহ্র কাজ, যিনি সব কিছুকে (উপযুক্ত পরিমাণে) সুসংহত করেছেন। প্রথমাবস্থায় কোন বস্তুর মধ্যে মজবুতি ছিল না। কারণ কোন বস্তুই ছিল না। সুতরাং মজবুতি না থাকা আরও উত্তমরূপে বোঝা যায়। তিনি অনস্তিত্বকে যেমন অস্তিত্ব এবং দুর্বলকে শক্তিদান করেছেন, তেমনি এর বিপরীত কর্মও তিনি করতে পারেন। কেননা, আল্লাহ্র শক্তিসামর্থ্য সবকিছুর সাথে সমান সম্বন্ধশীল; বিশেষত যেসব বস্তু একটি অপরটির সাথে সামঞ্জস্যশীল, সেগুলোতে এটা অধিক সুস্পষ্ট। এমনিভাবে আকাশ ও পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন হওয়ার কথা অন্যান্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে—وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ الخ এরপর শিংগায় দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়া হবে। এর ফলে আত্মাসমূহ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে দেহের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে এবং সমগ্র জগৎ যথাযথ ও নতুনভাবে ঠিকঠাক হয়ে যাবে। পূর্ববর্তী আয়াতে যে হাশরের

কথা বলা হয়েছিল, তা দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে হবে। অতপর আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ কিয়ামতে প্রতিদান ও শাস্তির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথমে ভূমিকাস্বরূপ বলা হয়েছে ঃ) নিশ্চয় তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ্ তা'আলা তা অবগত আছেন। (প্রতিদান ও শাস্তির এটাই প্রথম শর্ত। অন্যান্য শর্ত যেমন ক্ষমতা ইত্যাদি স্বতন্ত্র দলীল দ্বারা প্রমাণিত আছে। ভূমিকার পর এর বাস্তবতা আইন ও পদ্ধতি সহ বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) যে ব্যক্তি সৎকর্ম (অর্থাৎ ঈমান) নিয়ে আসবে (ঈমানের কারণে যে প্রতিদান সে পেতে পারে) সে (তার চাইতেও) উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। (যেমন সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ الخ—) এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে (অর্থাৎ কুফর ও শিরক), তাকে অগ্নিতে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে (তাদেরকে বলা হবে ঃ) তোমাদেরকে তো সেসব কর্মেরই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যেগুলো তোমরা (দুনিয়াতে) করতে। (এই শাস্তি অহেতুক নয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَهُمْ يُوزَعُونَ—এ শব্দটি وزع থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাধা দেওয়া। অর্থাৎ অগ্রবর্তী অংশকে বাধা দান করা হবে. যাতে পেছনে পড়া লোকও তাদের সাথে মিলে যায়। কেউ কেউ وزع শব্দের অর্থ নিয়েছেন ঠেলে দেওয়া অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا—এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহে মিথ্যা বলা স্বয়ং একটি গুরুতর অপরাধ ও গোনাহ; বিশেষত যখন কেউ চিন্তা-ভাবনা ও বোঝা-শোনার চেষ্টা না করেই মিথ্যা বলতে থাকে। এমতাবস্থায় এটা দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা যায় যে, যারা চিন্তাভাবনা করা সত্ত্বেও সত্যের সন্ধান পায় না এবং চিন্তা-ভাবনাই তাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়, তাদের অপরাধ কিছুটা লঘু। তবে তা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তওহীদে মিথ্যারোপ করা তাদেরকে কুফর, পথভ্রষ্টতা ও চিরস্থায়ী আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ এগুলো এমন জাজ্বল্যমান বিষয় যে, এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার ভ্রান্তি ক্ষমা করা হবে না।

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ الخ—فزع শব্দের অর্থ অস্থির ও উদ্বিগ্ন হওয়া। অন্য এক আয়াতে এ স্থলে فزع শব্দের পরিবর্তে صعق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ অজ্ঞান হওয়া। যদি উভয় আয়াতকে শিংগার প্রথম ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উভয় শব্দের সারমর্ম হবে এই যে, শিংগা

ফুঁক দেওয়ার সময় প্রথমে সবাই অস্থির উদ্বিগ্ন হবে, এরপর অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং অবশেষে মরে যাবে। কাতাদাহ্ প্রমুখ তফসীরকার এই আয়াতকে দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যার পর সকল মৃত পুনরুজ্জীবন লাভ করবে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সবাই জীবিত হওয়ার সময় ভীত-বিহবল অবস্থায় উত্থিত হবে। কেউ কেউ বলেন যে, তিনবার শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারে সবাই অস্থির হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ফুৎকারে অজ্ঞান হয়ে মরে যাবে এবং তৃতীয় ফুৎকারে হাশর-নশর কায়েম হবে এবং সকল মৃত জীবিত হয়ে যাবে। কিন্তু কোরআনের আয়াত ও সহীহ্ হাদীস থেকে দুই ফুৎকারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।—(কুরতুবী, ইবনে কাসীর) ইবনে মোবারক হাসান বসরী (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, উভয় ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে।—(কুরতুবী)

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ—উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের সময় কিছুসংখ্যক লোক ভীত-বিহ্বল হবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র এক হাদীসে আছে যে, তাঁরা হবেন শহীদ। হাশরে পুনরুজ্জীবন লাভের সময় তাঁরা মোটেই অস্থির হবেন না।—(কুরতুবী) সাঈদ ইবনে জুবায়রও বলেছেন যে, তাঁরা হবেন শহীদ। তাঁরা হাশরের সময় তরবারি বাঁধা অবস্থায় আরশের চার পার্শ্বে সমবেত হবেন। কুশায়রী বলেন, পয়গম্বরগণ আরও উত্তমরূপে এই শ্রেণীভুক্ত। কারণ, তাঁদের জন্য রয়েছে শহীদের মর্যাদা এবং এর ওপর নবুয়তের মর্যাদাও।—(কুরতুবী)

সূরা যুমারে আছে—— وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ

فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ—এখানে فزع শব্দের পরিবর্তে صعق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সংজ্ঞা হারানো। এখানে সংজ্ঞা হারিয়ে মরে যাওয়া বোঝানো হয়েছে। এখানেও إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ—ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী ছয়জন ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে। তাঁরা শিংগায় ফুৎকার দেওয়ার কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন না। পরবর্তী সময়ে তাঁরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। যে সকল তফসীরবিদ فزع ও صعق-কে একই অর্থ ধরেছেন, তাঁরা সূরা যুমারের অনুরূপ এখানে ব্যতিক্রম দ্বারা নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে বুঝিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই ব্যক্ত হয়েছে। যাঁরা পৃথক পৃথক অর্থে ধরেছেন তাঁদের মতে শহীদগণ فزع তথা অস্থিরতা থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত হবেন যেমন ওপরে বর্ণিত হয়েছে।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ—উদ্দেশ্য এই যে, পাহাড়সমূহ স্থানচ্যুত হয়ে মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে। দর্শক মেঘমালাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পায়, অথচ আসলে তা দ্রুত চলমান থাকে। যে বিশাল বস্তুর শুরু ও শেষ প্রান্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই বস্তু যখন কোন একদিকে চলমান হয় তখন তা যতই দ্রুতগতিসম্পন্ন হোক না কেন, মানুষের দৃষ্টিতে তা অচল ও স্থিতিশীল মনে হয়। সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ঘন কাল মেঘে সবাই তা প্রত্যক্ষ করতে পারে এরূপ কাল মেঘ এক জায়গায় অচল ও স্থির মনে হয়, অথচ তা প্রকৃতপক্ষে চলমান থাকে। এই মেঘের গতিশীলতা দর্শক যখন বুঝতে পারে, তখন তা আকাশের দিগন্ত উন্মুক্ত করে দূরে চলে যায়।

মোটকথা এই যে, পাহাড়সমূহের অচল হওয়া দর্শকের দৃষ্টিতে এবং চলমান হওয়া বাস্তব সত্যের দিক দিয়ে। অধিকাংশ তফসীরবিদ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, এই দুইটি অবস্থা দুই সময়কার। পাহাড়কে দেখে প্রত্যেক দর্শক যখন মনে করে যে, এই পাহাড় স্বস্থান থেকে কখনও টলবে না, অচল হওয়া সেই সময়কার। এবং تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ কথাটি কিয়ামত দিবসের দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কোন কোন আলিম বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন পাহাড়সমূহের অবস্থা কোরআন পাকে বিভিন্ন রূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ (১) চূর্ণ-বিচূর্ণ ও প্রকম্পিত হওয়া হবে পাহাড়সহ সম্পূর্ণ পৃথিবীর অবস্থা।

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا এবং إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا—

(২) পাহাড়ের বিশাল শিলাখণ্ডের ধুনো করা তুলার ন্যায় হয়ে যাওয়া وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ এটা তখন হবে, যখন ওপর থেকে আকাশও গলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে। পৃথিবী থেকে পাহাড় তুলার ন্যায় ওপরে ওঠে যাবে, ওপর থেকে আকাশ নীচে পতিত হবে এবং উভয়ে মিলিত হয়ে যাবে। يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (৩) পাহাড়সমূহ ধুনো করা তুলার মত একত্রিত হওয়ার পরিবর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا (৪) চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে যাওয়া قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا

(৫) চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধূলিকণার ন্যায় সারা বিশ্বে বিস্তৃত পাহাড়সমূহকে বাতাস ওপরে নিয়ে যাবে। তখন যদিও তা মেঘমালার ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন হবে; কিন্তু দর্শক তাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পাবে وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ তন্মধ্যে কতক অবস্থা শিংগায় প্রথম ফুৎকারের সময় হবে এবং কতক দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে হবে। তখন ভূপৃষ্ঠকে সমতল স্তরের মত করে দেওয়া হবে। তাতে কোন গুহা, পাহাড়, দালান কোঠা ও বৃক্ষ থাকবে না। قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا—(কুরতুবী-রূহুল মা'আনী। واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ—صنع শব্দের অর্থ কারিগরিবিদ্যা, শিল্প। أتقن শব্দটি اتقان থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন কিছুকে মজবুত ও সংহত করা। বাহ্যত এই বাক্যটি পূর্ববর্তী সব বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত; অর্থাৎ দিবা-রাত্রির পরিবর্তন এবং শিংগায় ফুৎকার থেকে নিয়ে হাশর-নশর পর্যন্ত সব অবস্থা। উদ্দেশ্য এই যে এগুলো মোটেই বিস্ময় ও আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা, এগুলোর স্রষ্টা কোন সীমিত জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মানব অথবা ফেরেশতা নয়; বরং বিশ্বজাহানের পালনকর্তা। যদি এই বাক্যটির সম্পর্ক নিকটতম وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً আয়াতের সাথে করা যায়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, পাহাড়সমূহের এই অবস্থা দর্শকের দৃষ্টিতে অচল; কিন্তু বাস্তবে চলমান ও গতিশীল হওয়াও মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। কেননা, এটা বিশ্বজাহানের পালনকর্তার কারিগরি, যিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا—এটা হাশর-নশর ও হিসাব-নিকাশের পরবর্তী পরিণতির বর্ণনা حسنة বলে এখানে কলেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বোঝানো হয়েছে (কাতাদাহ্‌র উক্তি)। কেউ কেউ সাধারণ ইবাদত ও আনুগত্য অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে তার কর্মের চাইতে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। বলা বাহুল্য, সৎকর্ম তখনই সৎকর্ম হয়, যখন তার মধ্যে প্রথম শর্ত ঈমান বিদ্যমান থাকে। 'উৎকৃষ্টতর প্রতিদান' বলে জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামত এবং আযাব ও যাবতীয়

কষ্ট থেকে চিরমুক্তি বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, এর অর্থ এই যে, এক নেকীর প্রতিদান দশ গুণ থেকে নিয়ে সাতাশ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। ---(মাযহারী)

وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ — فَزَعٍ বলে প্রত্যেক বড় বিপদ ও পেরেশানী বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেক আল্লাহ্‌ভীরু পরহেযগারও পরিণামের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে না এবং থাকা উচিতও নয়; যেমন কোরআন পাক বলে إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ অর্থাৎ পালনকর্তার আযাব থেকে কেউ নিশ্চিন্ত ও ভাবনামুক্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। এ কারণেই পয়গম্বরগণ, সাহাবায়ে কিরাম ও ওলীগণ সদাসর্বদা ভীত ও কম্পিত থাকতেন। কিন্তু সেইদিন হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত হলে যারা সৎকর্ম নিয়ে আগমনকারী হবে, তারা সর্বপ্রকার ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত ও প্রশান্ত হবে। والله أعلم

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ
شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ
اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

---

(৯১) আমি তো কেবল এই নগরীর প্রভুর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন। এবং সবকিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আজ্ঞাবহদের একজন হই। (৯২) এবং যেন আমি কোরআন পাঠ করে শোনাই। পর যে ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই সৎপথে চলে এবং কেউ পথভ্রষ্ট হলে আপনি বলে দিন, 'আমি তো কেবল একজন ভীতি প্রদর্শনকারী।' (৯৩) এবং আরও বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। সত্বরই তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদেরকে দেখাবেন। তখন তোমরা তা চিনতে পারবে। এবং তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আপনার পালনকর্তা গাফেল নন।'

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে পয়গম্বর (সা), মানুষকে বলে দিন,] আমি তো কেবল এই (মক্কা) নগরীর (সত্যিকার) প্রভুর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে (নগরীকে) সম্মানিত

করেছেন। (এই সম্মানের কারণেই একে হেরেম করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেন ইবাদতে কাউকে শরীক না করি) এবং (তাঁর ইবাদত কেন করা হবে না, যখন) সবকিছু তাঁরই (মালিকানাধীন)। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি (বিশ্বাস ও কর্ম সবকিছুতে) তাঁর আজ্ঞাবহদের একজন হই। (এ হচ্ছে তওহীদের আদেশ) এবং (আরও আদেশ এই যে,) যেন আমি (তোমাদেরকে) কোরআন পাঠ করে শুনাই (অর্থাৎ বিধানাবলী প্রচার করি, যা নবুয়তের জরুরী অংগ)। অতপর (আমার প্রচারের পর) যে ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই সৎপথে চলে (অর্থাৎ সে আযাব থেকে মুক্তি এবং জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামত লাভ করবে। আমি তার কাছে কোন আর্থিক অথবা প্রভাবগত উপকার চাই না) এবং কেউ পথভ্রষ্ট হলে আপনি বলে দিন, (আমার কোন ক্ষতি নেই। কারণ,) আমি তো কেবল সতর্ককারী (অর্থাৎ আদেশ প্রচারকারী) পয়গম্বর। (অর্থাৎ আমার কাজ আদেশ পৌঁছিয়ে দেওয়া। এরপর আমার দায়িত্ব শেষ। না মানলে তোমাদেরকেই শাস্তি ভোগ করতে হবে।) আপনি (আরও) বলে দিন, (তোমরা যে কিয়ামতের বিলম্বকে আর না হওয়ার প্রমাণ মনে করে কিয়ামতকে অস্বীকার করছ, এটা তোমাদের নির্বুদ্ধিতা। বিলম্ব কখনও প্রমাণ হতে পারে না যে, কিয়ামত কোনদিন হবেই না। এ ছাড়া তোমরা যে আমাকে দ্রুত কিয়ামত আনার কথা বলছ, এটা তোমাদের দ্বিতীয় ভ্রান্তি। কেননা আমি কোনদিন দাবি করিনি যে, কিয়ামত আনা আমার ক্ষমতাধীন। বরং) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। (ক্ষমতা, জ্ঞান, হিকমত সবই তাঁর। তাঁর হিকমত যখন চাইবে, তিনি কিয়ামত সংঘটিত করবেন। হ্যাঁ এতটুকু আমাকেও জানানো হয়েছে যে, কিয়ামতের বেশি বিলম্ব নেই। বরং) সত্বরই তিনি নিদর্শনসমূহ (অর্থাৎ কিয়ামতের ঘটনাবলী) তোমাদেরকে দেখাবেন। তখন তোমরা সেগুলোকে চিনবে। (তবে চিনলেও কোন উপকার হবে না) আর (শুধু নিদর্শনাবলী দেখানোই হবে না; বরং তোমাদেরকে মন্দ কর্মের শাস্তিও ভোগ করতে হবে। কেননা) আপনার পালনকর্তা সে সম্পর্কে গাফিল নন, যা তোমরা কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ—অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে بلدة বলে মক্কা মুকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। এখানে বিশেষ করে মক্কার পালনকর্তা বলার কারণ মক্কার মাহাত্ম্য ও সম্মানিত হওয়ার বিষয়বস্তু প্রকাশ করা। حرم শব্দটি تحريم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাধারণ সম্মানও হয়ে থাকে। এই সম্মানের কারণে মক্কা ও পবিত্র ভূমির যেসব বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, সেগুলোও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; যেমন কেউ হেরেমে আশ্রয় নিলে সে নিরাপদ হয়ে যায়। হেরেমে প্রতিশোধ

গ্রহণ করা ও হত্যাকাণ্ড সম্পাদন বৈধ নয়। হেরেমের ভূমিতে শিকার বধ করাও জায়েয নয়। বৃক্ষ কর্তন করা জায়েয নয়। এসব বিধানের কতকাংশ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا

আয়াতে, কতকাংশ সূরা মায়িদার শুরুতে এবং কতকাংশ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ —আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।